জাতির ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপহাস
... পৃঃ ২৭

স্বস্তিকা

সর্বভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব
... পৃঃ ২১

৬৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ২ মার্চ ২০১৫।। ১৭ ফাল্গুন - ১৪২১।। website : www.eswastika.com ।। দাম : দশ টাকা

সামাজিক সমতা ও দোল উৎসব

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৭ ফাল্গুন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২ মার্চ - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য বিজেপির ১ লক্ষ ২৪ হাজার সদস্য আজ ২০ লক্ষে পৌঁছালেও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : দিদির বাড়ি যামু, ইলিশ ভাজা খামু ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

দিল্লী বিধানসভার নির্বাচন : মন্দের ভালো হয়েছে ▯ এন সি দে ▯ ১২

দোল উৎসব ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন ▯ ড: স্বয়ংদীপ্ত বাগ ▯ ১৪

ভোটব্যাঙ্ক নয়, সামাজিক মিলনের পটভূমি হয়ে উঠুক দোল ▯ সারথি মিত্র ▯ ১৬

এবার মানুষ রুখে দাঁড়াক ▯ শ্যামল কুমার হাতি ▯ ২০

সর্বভারতীয় সংগীত, নৃত্য ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ২১

বেদান্তের সারতত্ত্ব ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ২৩

জাতির ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপহাস ▯ জে এস রাজপুত ▯ ২৭

অসমে পুর নির্বাচন, রাজস্থানে পঞ্চায়েত নির্বাচন : ক্রমেই জনসমর্থন হারাচ্ছে কংগ্রেস ▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৯

মূল্যবোধ কি আজ সত্যিই বিপন্ন? ▯ বরুণ দাস ▯ ৩০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ - ৩৮** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এবিভিপি'র উত্থানে রাজ্যের ছাত্র-রাজনীতিতে কি নতুন সমীকরণ?

বিগত বছরের হিসেবকে পিছনে ফেলে রাজ্যের ছাত্র রাজনীতিতে দারুণভাবে এগিয়ে আসছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। অনেক কলেজেই তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। রীতিমতো লড়াই করেই ক্ষমতায় এসেছে কয়েকটি কলেজে, এমনকী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাসেও। পাশাপাশি বিদ্যার্থী পরিষদকে আটকাতে তৈরি হয়েছে বিরোধীদের নতুন সমীকরণ। এই প্রসঙ্গেই এবারের বিশেষ বিষয়। লিখেছেন শুভাশিস রায়। সঙ্গে এবিভিপি-র পশ্চিমবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মনের সাক্ষাৎকার এবং জেলার বিজয়ী ছাত্র নেতাদের বক্তব্য।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

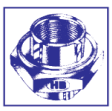

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কর্পোরেট গুপ্তচরবৃত্তি

সম্প্রতি সরকারি গোপন নথি ফাঁস হওয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক হইতে নথি চুরির ঘটনার অভিযোগে ইতিমধ্যে রিলায়েন্স, কেয়ার্নস, আডাগ রিলায়েন্স-সহ একাধিক বেসরকারি শক্তি উৎপাদন সংস্থার কয়েকজন কর্মী গ্রেপ্তারও হইয়াছে। চুরি হওয়া তথ্যের ভিতরে রহিয়াছে জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্পর্কিত গোপন স্ট্যাটাস রিপোর্ট, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব নৃপেন্দ্র মিশ্রের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককে লেখা চিঠি, ভারত-শ্রীলঙ্কার চুক্তির খসড়া-সহ শক্তিসম্পদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার খসড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকশো কোটি টাকার সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব। এই সমস্ত তথ্য চুরির নেপথ্যে সরকারি নীতি সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে বলিয়াই মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কর্পোরেট গুপ্তচরবৃত্তি বা তথ্য ফাঁসের মতো অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের শিকড় যে অনেক গভীরে প্রোথিত, এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। সেই সূত্রেই এমন কিছু কর্মকাণ্ডের কথা উঠিয়া আসিয়াছে যাহা অনভিপ্রেত হইলেও সরকারি দপ্তরে নিয়মিতই ঘটিয়া থাকে বলিয়া অভিযোগ। যেমন, মাল্টি টাস্কিং কর্মীরা সহজেই মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ ঘরগুলিতে প্রবেশের সুযোগ পাইয়া থাকে। ভুয়ো ছাড়পত্র লইয়া জুনিয়র কর্মীদের গাড়ি ঢোকার জন্য সি আই এস এফ আধিকারিকরা অনুমতি দেন। অত্যন্ত মূল্যবান বিভিন্ন সরকারি নীতি যাহা হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেনকে প্রভাবিত করিতে পারে, সেইসব যদি সরকারের অগোচরে নিয়মিতভাবে বাহিরে এমন কিছু সংস্থার নিকট পৌঁছাইয়া যায়, যাহাদের স্বার্থ সেইসব সরকারি সিদ্ধান্তের সহিত যুক্ত, সেই ক্ষেত্রে দুর্নীতির ফাঁস আরও গভীর হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সাম্প্রতিক তথ্য ফাঁসের ঘটনা ইহাও প্রমাণ করে যে দুর্নীতি-চক্রের সামনে সরকারি কর্মীরা ঠিক কতখানি অবলীলায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। মাত্র কয়েক হাজার টাকার বিনিময়েই মহামূল্যবান তথ্য পাচার হইয়া যায়। অন্যদিকে এমনও অভিযোগ উঠিয়াছে যে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে অপরিমেয় অর্থের আদান-প্রদান সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিবার জন্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমগ্র ব্যাপারটি আদপেই স্বস্তিকর নয়।

গুপ্তচর বৃত্তির ঘটনা ইহাই প্রথম নহে। গত বছর জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরির অফিস ঘরে গুপ্তচরবৃত্তির উপকরণ থাকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি-র ফোন ট্যাপিং-এর কথা প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১২ সালে ইউপিএ-২ সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির অফিসে গুপ্তচরবৃত্তির সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। ইউপিএ সরকার কয়লা কেলেঙ্কারি সম্পর্কিত ফাইল চুরির কথাও বলিয়াছিলেন। আমাদের সরকারি ব্যবস্থার বিড়ম্বনা হইল সাধারণ মানুষকে যেখানে সামান্য বিষয় জানিতেও অনেক কাঠখড় পুড়াইতে হয়, সেইখানে স্বার্থান্বেষী-গোষ্ঠী দেশের পক্ষে অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্যও হাতে পাইয়া যায়। আর এইসব তথ্যের ভিত্তিতে তাহারা নিজেদের রণকৌশল এমনভাবে স্থির করিয়া থাকে যাহাতে সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা যাইতে পারে।

তাই গুপ্তচরবৃত্তির এই ঘটনার যথোপযুক্ত তদন্ত হওয়া দরকার। ইহা অবশ্যই জানা প্রয়োজন, এই গুপ্তচরবৃত্তির পশ্চাতে আসল খেলোয়াড়টি কে? এযাবৎ এই দেশে যেসব গুপ্তচরবৃত্তির কাণ্ডের তদন্ত হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহার ফয়সালা হয় নাই। দেশের মানুষের ইহা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে ইহার পিছনে কে বা কাহারা কলকাঠি নাড়াইতেছে। কেবলমাত্র কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিলেই হইবে না, যাহারাই এই কাজে সামিল এবং যাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হইতেছে, তাহাদের সবাইকেই আইন মোতাবেক সাজা দিতে হইবে। সুখের কথা, নরেন্দ্র মোদী সরকার এই জাতীয় দুর্নীতির অনুসন্ধান এবং তাহাদের সমূলে উৎপাটনের কাজে তৎপর হইয়াছে। মোদী সরকার অন্তত এখনও পর্যন্ত প্রশাসনিক দুর্নীতি রোধের লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক আভাস দিতে পারিয়াছে। কর্ম-সংস্কৃতির স্তরে যে মৌলিক একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে, সেই বিষয়ে বণিক মহলের অনেকেই একমত। সেই পরিবর্তন একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়িবার লক্ষ্যেই তৎপর, এমন ধারণা অসংগত হইবে না।

সুভাষিত

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষ তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ।। (চাণক্যনীতি)

জ্ঞানীব্যক্তি সত্য, মধুর, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য বলে থাকেন। আবার আত্মপ্রশংসা ও অপরের নিন্দা সবসময় বর্জন করেন।

সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ কলকাতা সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কোন পথে বাংলার রেনেসাঁসের সাক্ষী এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে তার সন্ধানে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়েছে। আগামী এপ্রিলের মধ্যেই কমিশন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি নবান্নে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এর পূর্বে বামফ্রন্ট আমলে সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কলকাতা সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত তো হয়ইনি বরঞ্চ দিনে দিনে সরকারের উদাসীনতায় এরাজ্যের সংস্কৃত কলেজগুলি বিলুপ্তির পথে। ১৮৯ বছরের প্রাচীন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের দৈন্যদশা নিয়ে কোনো সরকারই উদ্যোগ নেননি। এই মুহূর্তে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ৬টি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। পাশ কোর্সে রয়েছে ২টি বিষয়। স্নাতকস্তরে সংস্কৃত, পালি, প্রাচীন ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস এবং ভাষাবিজ্ঞানের উপরেই জোর দেওয়া হয় বেশি। পাশাপাশি রয়েছে ইংরেজি ও বাংলা। ২০১২ সাল পর্যন্ত এখানে স্নাতকস্তরে পড়তে হলে পাশে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে কোনো না কোনো প্রাচ্যভাষা রাখা ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর্তৃপক্ষের গড়িমসি এবং সরকারি উদাসীনতায় এই নিয়ম গত বছর থেকে উঠে গিয়েছে। ৫৬টি শিক্ষকপদে এই মুহূর্তে রয়েছেন মাত্র ২৩ জন। কলেজে প্রফেসর পদে এখন একজনও নেই। যাঁরা রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অ্যাসোসিয়েট অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। গ্রুফ বি ও সি পদে ২২ জনের মধ্যে রয়েছেন মাত্র ৯ জন শিক্ষাকর্মী। ৩৭টি গ্রুফ ডি পদে এখন রয়েছেন ১৮ জন। এ রাজ্যে ৬৫০টির মতো টোল রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন সংস্কৃত কলেজের টোল। কিন্তু গত ৭ বছর ধরে টোলের কোনো পরীক্ষা হয়নি। টোল বিভাগে ২২টির মধ্যে ১৯টি বর্তমানে শূন্য।

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রায় ২২ হাজার পুঁথি। বইয়ের সংখ্যাও লক্ষাধিক। বিশাল লাইব্রেরিতে কাজ করেন মাত্র ৯ জন কর্মী। যদিও সরকারি পদের সংখ্যা ২২। সরকার পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণে সব সময়ের একজন বিশেষজ্ঞের পদ তৈরি করতে পারেননি। দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলিকে সংরক্ষণের জন্য সে ধরনের প্রযুক্তি ও রাসায়নিকের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা হয়নি। সংস্কৃত কলেজের টোলের ছাত্রদের জন্য বিধান সরণির কাছে নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের হস্টেলটি ইতিমধ্যেই প্রোমোটারকে বেচে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার মতোই নবদ্বীপের সরকারি সংস্কৃত কলেজটিরও কোনো সংরক্ষণ হয়নি, জোটেনি সামান্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। কলেজ বিল্ডিংয়ের অবস্থা জরাজীর্ণ, ঘরদোর আগাছায় ভরা, কোথাও বা ভেঙে পড়েছে ছাদ। অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ অবসর নেওয়ার পর সরকার আর কোনো অধ্যাপক নিয়োগ না করায় আজ কুড়ি বছর সংস্কৃত কলেজটির পঠন-পাঠন বন্ধ। এরই মধ্যে কলেজের কিছু অংশে প্রমোটারির থাকা পড়েছে। অথচ বামসরকারের মতো বর্তমান সরকারও এ বিষয়ে উদাসীন। যদিও একদিন তুর্কি পাঠানদের অত্যাচার সহ্য করেও নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত শিক্ষার পুণ্যপীঠে জ্ঞানের প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। নব্য ন্যায়ের যে প্রতিভা বাংলাকে বিশ্বের দরবারে সম্মান এনে দিয়েছিল এই নবদ্বীপেই ছিল সেই জ্ঞানের কর্ষণভূমি। অন্যদিকে কোচবিহার রাজার আমলে তৈরি কোচবিহার রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজটি আজ সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। দিনদুপুরে চলছে মদের ভাটি। কারণ সরকারের চরম উদাসীনতা ও সুষ্ঠু পরিকাঠামোর অভাবে পঁচিশ বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে কলেজটি। অথচ এই কলেজে ১০টি বিষয় নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ ছিল এবং পাঠদানের জন্য ছয়জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।

নবদ্বীপ ও কোচবিহারে সরকারি সংস্কৃত কলেজ দুটি বন্ধ হয়ে গেলেও পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির সংস্কৃত কলেজটি এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে আগামী দিনে এই কলেজটিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। ৭টি বিষয় নিয়ে কলেজের পঠন-পাঠন আরম্ভ হলেও আজ মাত্র একজন অধ্যাপক রয়েছেন। কলেজ ভবনটির অবস্থা জরাজীর্ণ। পূর্বে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমান ছাত্রাবাসটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। গৃহের অভাবে মূল্যবান পুঁথিগুলি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। নিয়মিত পরীক্ষা না হওয়ায় ছাত্রদের সংখ্যা নগণ্য। কলকাতা কলেজের অধ্যক্ষ উপল সেনের কথায়। আমরা চাই কলকাতার প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠুক। ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড বাদে সব রাজ্যেই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কয়েকটি রাজ্যে একাধিক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কমিশনের প্রধান নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেছেন, কলকাতার ঐতিহ্যশালী প্রাচীন এই কলেজটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা নিয়ে পরিকাঠামোর কোনো সমস্যা হবে না। এখানে ছাত্রেরও কোনো অভাব নেই। ■

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রসংখ্যা			
সংস্কৃত	পালি	ভাষাবিজ্ঞান	প্রাচীন ইতিহাস
৩৫ জন	৬ জন	৬ জন	৯ জন
(মোট আসন ৫২)	(মোট আসন ২৬)	(মোট আসন ২৫)	(মোট আসন ২৫)
*অবশ্য বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে সবকটি আসনই পূর্ণ।			

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার খাতিরে কেন্দ্রের নজর ভারত-মহাসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনের আগ্রাসন রুখতে অভূতপূর্ব ও অভিনব কূটনৈতিক কৌশল নিল মোদী-সরকার। আগামী মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চীন সফরে যাবার কথা। তার আগে ভারত- মহাসাগরের চারটি দেশে যাবেন তিনি, এমনটাই খবর বিদেশ-মন্ত্রক সূত্রে। সরকারের ভারত-মহাসাগর কূটনীতির মূল লক্ষ্য এখন, মহাসাগর ঘিরে পূর্ব আফ্রিকার যে দেশগুলি রয়েছে তাদের সঙ্গে 'অতীত সম্পর্ক' ঝালিয়ে এই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করা। মূলত দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের দিকে নজর দিতেই সরকারের এই তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছেন। ভারত- মহাসাগর ঘিরে থাকা এশিয়া ও আফ্রিকা-র দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সহস্রাধিক বছরের পুরোনো হলেও দেশের কূটনৈতিক কৌশলে এহেন গুরুত্ব তারা আগে পায়নি। যার ফলে চীনের মতো ভারতের শত্রুভাবাপন্ন দেশ ভারত-মহাসাগরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। কূটনৈতিক কৌশলের এই উলটপুরাণেই এবার সচেষ্ট ভারত।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ওমানের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। ভারত মহাসাগরে পাইরেসি-বিরোধী অভিযানকেই তাঁর আলোচনায় মুখ্য বিষয় করেন তিনি। তার আগের দিনই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে অসামরিক নিউক্লিয়ার চুক্তি সম্পাদন করে ভারত। সম্প্রতি মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী দুন্যা মাউমুন দিল্লীতে উড়ে এসে সুষমার সঙ্গে মোদীর দ্বীপরাষ্ট্র ভ্রমণের সফরসূচি চূড়ান্ত করে যান। আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে কলম্বো সফরে যাচ্ছেন দেশের বিদেশমন্ত্রী। মূলত মোদীর ঘুরে আসার পর তার অনুবর্তী প্রয়াস (ফলো আপ) হিসেবে এই সফর বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর। এই সবকিছুই মোটামুটি একই সূত্রে বাঁধা। তা হলো ভারত মহাসাগরের দেশগুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ভারত মহাসাগরে চীনকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া। সূত্রের খবর, আগামী ১০ মার্চ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত মহাসাগরের চারটি দেশ ভ্রমণের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রকল্পের সূচনা করবেন। শ্রীলঙ্কা ছাড়াও তিনি মালদ্বীপ, মরিশাস ও সিসিলি সফরও করবেন তিনি।

মোদী ও সুষমা এই সফরসূচির বিষয়ে আলাদা করে বসছেন বলে খবর। কূটনৈতিক কৌশলগত কারণে ভারত যে সব দেশগুলিকে আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছে সেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদী উপস্থিত থাকছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ভারত মহাসাগরের দেশ ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকে সমগুরুত্ব দিয়ে দেখতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হচ্ছেন বলে সরকারি সূত্রের সংবাদ। ১৯৮১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সফরের পর মোদী-ই

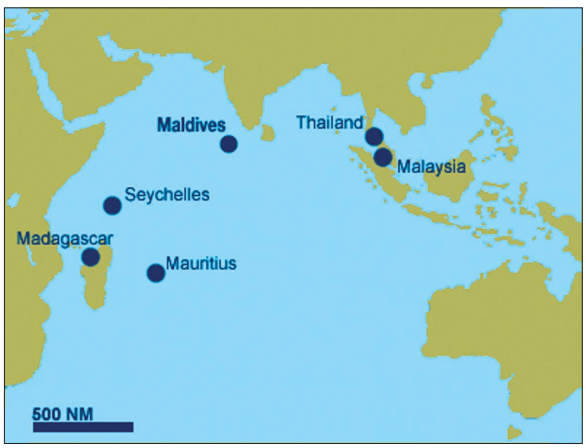

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে

- ভারত মহাসাগরের পূর্ব আফ্রিকার, আরবীয় উপদ্বীপ, ভারতীয় উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিনিময় পুনঃস্মরণ করতে চাইছে ভারত সরকার।
- ১৯৮১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর পর নরেন্দ্র মোদীই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সেচিলিস সফরে যাচ্ছেন।
- দ্বিমুখী ও বহুমুখী কাঠামো-এ ভারত তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাকে আরও জোরদার করতে চাইছে।

হচ্ছেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সেসিলি সফরে যাচ্ছেন। তবে কূটনীতিজ্ঞরা মনে করছেন আগামী মে মাসে ক্ষমতায় আসার বর্ষপূর্তির মাঝেই তাঁর চীন সফর মোদীর সবচেয়ে কঠিনতম বিদেশ সফর হতে চলেছে। তাঁরা এও মনে করছেন মোদীর ভারত মহাসাগর সফর যদি ছোটো ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা ও সেনা-সহযোগিতা বাড়াতে সক্ষম হয় তবে চীনের ওপর পালটা চাপ তৈরি করার সুবিধা ভারত পাবে। নয়াদিল্লী একইভাবে তার সামুদ্রিক প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে শান্তির বার্তাও দিতে চাইছে। ■

‘সুদিন আসছে’ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জানালেন বানজারা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শেখ সোহরাবুদ্দিন ও ইসরত জাহান জাল এনকাউন্টার মামলায় দীর্ঘ আট বছর জেলে থাকার পর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি গুজরাট পুলিশের প্রাক্তন ডি আই জি ডিজি বানজারা বলে দিয়ে গেলেন যে আচ্ছে দিন আসছে তাঁর ও অন্যান্য গুজরাট পুলিশ আধিকারিকদের জন্য। অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস বানজারা এদিন বেরিয়ে আসেন গুজরাটের সবরমতী সেন্ট্রাল জেল থেকে। গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় ২০০৪ ও ২০০৫ সালে গুজরাটে পর পর দু’টি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে। সেই প্রসঙ্গে তুলে বানজারা বলেন : ‘এনকাউন্টারগুলি মিথ্যা ছিল না। আমরা কোনো ভুল কাজ করিনি। আমরা আইনের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলাম এবং যা কিছু করেছি সবই দেশের প্রতি কর্তব্য ভেবে। আমরা আসলে গুজরাটকে কাশ্মীর হওয়া থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম।’ তাঁর আরও বক্তব্য, এনকাউন্টারগুলি ‘আসল’ ছিল এবং এই মামলাটা ছিল ‘জাল’। একইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, ‘যেহেতু মামলাটি বিচারাধীন, তাই এনিয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে আমার মতে আইনি মোতাবেক যতক্ষণ না অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হচ্ছে, তিনি নির্দোষ।’

বানজারা

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরাবুদ্দিন শেখ এনকাউন্টার মামলায় গ্রেপ্তার হন বানজারা। তারপর থেকে তিনি জেলেই ছিলেন। জেলে বসেই অবসর নেন গত বছরের জুনে। জেলে বসে তাঁর কিছু পদক্ষেপ একদা রাজনৈতিক ঝড় তুলেছিল। সেই প্রসঙ্গে বলেন, তিনি অতীত নিয়ে বাঁচেন না, বাঁচেন বর্তমান নিয়ে। তবে সেইসঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির দিকেও আঙুল তোলেন তিনি। ঠারেঠোরে জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় স্তরের রাজনৈতিক চাপের কাছে অনেক সময়ই নতিস্বীকার করতে হয়েছে। জামিন পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর বাড়ি মুম্বই উড়ে যান। এই শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন হয়েছে যে আপাতত তিনি গুজরাটের বাইরে থাকবেন। যাতে গুজরাট পুলিশকে প্রভাবিত করতে না পারেন। এই প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বক্তব্য, যেভাবে গুজরাট পুলিশকে প্রতিপদে হেনস্থা করা হচ্ছে তাতে তিনি ব্যথিত।

গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার পরে ইউপিএ পরিচালিত কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এলে একশ্রেণীর রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী গুজরাটের বিজেপি সরকার ও প্রশাসনকে হেয় করতে উঠে পড়ে লাগে। এরই শ্লেষ ছিল বানজারার গলায়। তবে মোদীর সুদিন আসার স্লোগান যে তিনিও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

মালদার বৈষ্ণবনগর হাইস্কুলের অর্থ বরাদ্দকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

সংবাদদাতা : মালদা॥ মালদা জেলার কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর হাইস্কুলে সরস্বতী পূজার পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জলসা করা এবং সেই জলসাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশি অর্থ বরাদ্দকে কেন্দ্র করে বিবাদ এবং মারামারিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে ওই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ ফেব্রুয়ারি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরস্বতী পূজার জন্য ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু জলসা করার জন্য ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করায় ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানায়। তাদের দাবি সরস্বতী পূজায় কম অর্থ বরাদ্দ করা হবে কেন? বিদ্যালয় থেকে এই বার্তা স্থানীয় মুসলমান কুলিদের মারফত বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা থেকে গণ্ডগোল শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদ্যালয়ে ৭০ শতাংশ ছাত্র হিন্দু এবং ৩০ শতাংশ ছাত্র মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এই অতিরিক্ত অর্থ জলসার জন্য বরাদ্দ হওয়াতেই স্বভাবতই হিন্দু ছাত্রদের ক্ষোভ শুরু হয়। জানা গেছে, বিদ্যালয়ের সম্পাদক মুসলমান হওয়ার জন্যই এই বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে জলসার জন্য। মুসলমান দুষ্কৃতীরা প্রথমে হিন্দুদের মারতে শুরু করলে পাল্টা হিন্দুরাও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন শান্তি কমিটি গঠন করে বৈঠক ডাকার ব্যবস্থা করলেও মুসলমানরা সেই বৈঠক বয়কট করে। ফলে বৈষ্ণবনগরে ১৪৪ ধারা জারি হয়। বর্তমানে এলাকাতে উত্তেজনা রয়েছে। মুসলমানরা আলাদা বাজার করেছে এবং সেখানে তারা বেচা-কেনা করছে। এই ঘটনায় উভয় সম্প্রদায়ের ১০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বৈষম্যের জন্য এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল তাদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ কিছুই করেনি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের হাট-বাজারে হিন্দুদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গা হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। ফলে উত্তেজনা রয়েছে এলাকাতে। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে।

মন্ত্রীদের ঘরে ঘরে সরকারি সংস্থার কর্তাদের ঢুঁ মারার অভ্যাস ছাড়তে বললেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দিল্লী থেকে প্রকাশিত এক হালফিলের প্রতিবেদনে কেন্দ্রের ক্ষমতার অলিন্দগুলিতে নানান পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং ও করপোরেট কর্তাদের অবাধে যাতায়াত করার দীর্ঘদিনের চালু রীতি প্রায় উঠতে বসেছে বলে জানা যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তার বয়ান অনুযায়ী অর্থনীতি, শক্তি ও পেট্রোলিয়াম (Power and oil ministries) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির সর্বোচ্চ কর্তাদের এখন তাঁদের মক্কেলদের কাছে যথেষ্ট নজরানা দাবি করার অভ্যাস আর নজরে পড়ছে না। একথা প্রতিরক্ষা দপ্তর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সারা নর্থ ব্লকে একটা বার্তা নীরবে ছড়িয়ে রয়েছে দুর্নীতি করার কোনো জায়গা এখানে নেই। কোনো করপোরেট আধিকারিক তাঁর প্রস্তাব সরকারের যথাযোগ্য জায়গায় বিবেচনার জন্য পেশ করতে চাইলে তাঁকে নানান শ্রেণীর আমলার গেরো খুলে হাত ভারী করতে করতে যেতে হচ্ছে না। মনে রাখবেন এটি প্রতিশ্রুতি নয় বরং গত ন' মাসের সময়কালে ব্যবসায়ী মহলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখেই এই তথ্য উঠে এসেছে। আরও খোলসা করে বললে বলতে হবে ব্যবসায়ী মহলকে কথা শোনার জন্য কোনো খরচা করতে হচ্ছে না। এর ফলে এতদিনের 'এমনটাই তো হয়ে থাকে'-এর প্রচলিত রীতি থেকে এই ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে যাওয়ার তাৎক্ষণিক অভিঘাতে অনেক বিভাগে আগের থেকে অর্থনৈতিক প্রস্তাব আসার সংখ্যাই কমে গেছে। অবশ্যই এটি সাময়িক। সকলেই পরিস্থিতির গতি প্রকৃতি সরেজমিনে মাপছেন। এক স্বনামধন্য ব্যাঙ্ক কর্তার কথায় 'operation clean up' -এর ধাক্কায় এক নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা সাময়িক হলেও দেখা দিয়েছে। আগে কারবারিরা কাজ ওঠানোর যে ঘরোয়া কায়দায় নিজের লোক ফিট করে কাজ হাসিল করতেন তার জায়গা নিয়েছে 'to be considered on merit'-এর নীতি। তার ফলে এক সম্প্রদায়ের ব্যবসাদাররা মুশকিলে পড়েছেন। তিনি আরও বলেন যে কাল কি হবে বলা না গেলেও আজকের তারিখে কাজের পদ্ধতি প্রায় ১০০ শতাংশ স্বচ্ছ। ওই কর্তার কথায় আরও উঠে এসেছে মিডিলম্যান ও ক্ষমতার দালালদের সর্বোচ্চ জায়গায় অনায়াস অধিকার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরেই শক্তিমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও পেট্রোলিয়াম দপ্তরের মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সরাসরি ঘোষণা করে দালাল চক্র ভেঙে দেন। এর প্রভাব হয় বিধ্বংসী। এদের প্রথমেই রাস্তা দেখান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তিনি ঘড়ি ধরে সকাল ১১টা থেকে নর্থ ব্লকে তাঁর দপ্তরে করপোরেট কর্তাদের সারাদিন কনিষ্ঠ আমলা বা বাবুদের সঙ্গে দিনের পর দিন ভাব জমিয়ে কার্যসিদ্ধি করার লাগু থাকা প্রথার অবসান ঘটান। এখন আর কোনো কেষ্ট বিষ্টুকেই সেখানে পা ফেলতে দেখা যায় না। এগুলি কিন্তু দিল্লীর ক্ষমতার অলিন্দে অনেকেই চাক্ষুষ করছেন।

সূত্র অনুযায়ী, বহু সরকার অধিগৃহীত সংস্থার (ব্যাঙ্ক সহ) কর্তাদের সুনির্দিষ্টভাবে দিল্লী আসতে নিষেধ করা হয়েছে যতক্ষণ না তাদের ডাকা হচ্ছে। ফুল বা নানান তোড়া নিয়ে ঘোরাফেরাকে হাতে নাতে ধরতে অধিকাংশ দপ্তরে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

আর একটি সূত্র অনুযায়ী, ওয়েল সেক্টর কোম্পানিগুলি নিচু তলার বাবুদের হাত করতে তাদের অনেককেই গাড়ি উপঢৌকন দেওয়ার রেওয়াজ চালু করে ফেলেছিল, যাতে তারা যথাযোগ্য জায়গায় কর্তাদের ভেট করিয়ে দিতে পারে। তেলমন্ত্রী এই প্রথা সমূলে উপড়ে দিয়ে বলেছেন প্রয়োজন বুঝলে দপ্তর থেকে গাড়ি দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত অর্থ দপ্তরে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ককর্তা এস কে জৈন গ্রেপ্তার হওয়ার পর অত্যন্ত জোরালো বার্তা গেছে যে টাকার থলি দেখিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সময় বের করার জঘন্য প্রথা গত ন' মাসেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গোটা পদ্ধতিই ঢেলে সাজানো হয়েছে। এগুলি প্রচারের জিনিস নয়, তাই ঢাক পেটানো হচ্ছে না। ওয়াকিবহাল মহল তাদের দীর্ঘ দিনের দিল্লীর ক্ষমতা অলিন্দের অভিজ্ঞতা সূত্রে জানাচ্ছেন, রাজধানীর 'গিভ অ্যান্ড টেক' পদ্ধতিতে সরকারি অর্থের লুটপাট ও ফিট করানোর সংস্কৃতির দিন হয়ত শেষ হতে চলেছে।

এদিকে নিয়মিত টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার হাতেনাতে ধরা পড়ায় রাজধানীতে শোরগোল পড়ে গেছে। এতকাল এসব ভাবাই যায়নি--- এমনটাই তথ্যাভিজ্ঞমহলের অভিমত।

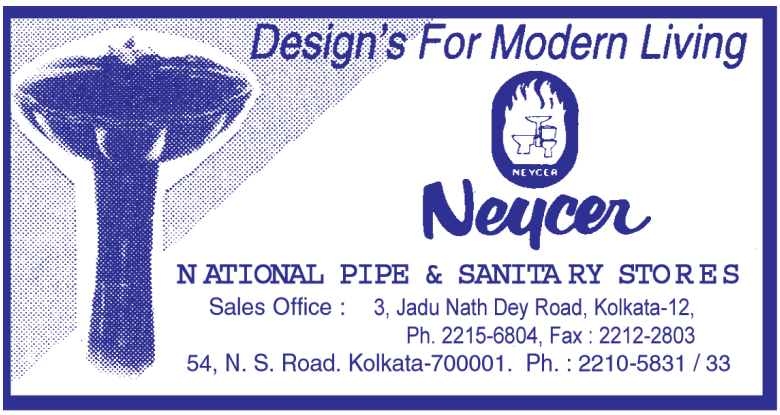

লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য-বিজেপি-র ১ লক্ষ ২৪ হাজার সদস্য আজ ২০ লক্ষে পৌঁছালেও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন

দুর্নীতির পাঁকে গলা পর্যন্ত ডোবা তৃণমূল নেতৃত্বকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে বনগাঁ কৃষ্ণগঞ্জের উপনির্বাচনে সাফল্য। মমতা দাবি করেছেন সংবাদমাধ্যমের কুৎসা জনমানসে আঁচড় কাটতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে মমতার দাবিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ভোটের ফলাফলের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের ভোট পার্সেন্টেজ যথেষ্টই কমেছে। দলের জয় এসেছে প্রায় ৩২ শতাংশ মুসলমান ভোটদাতাদের সুসংগঠিত ভোটদানে। যে কোনো মূল্যেই বিজেপিকে আটকাতে হবে এটাই ছিল মন্ত্র। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এই দুটি কেন্দ্রে মুসলমান ভোটদাতারা যথেষ্ট প্রভাবশালী। তারা মনে করে বিজেপি হিন্দুদের পার্টি। শত চেষ্টাতেও মুসলমানদের এই ভুল ধারণা বদলানো যাচ্ছে না। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ফৌজদারি আইন সংশোধন করে ধর্মীয় বিভাজন রুখতে বিল আনছে চলতি বাজেট অধিবেশনে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। মৌলানা মৌলবিরা মগজ ধোলাই করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বিজেপি হিন্দু পার্টি। সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমান ভোট দিল্লীতে যেমন আম আদমি পার্টিকে জিতিয়েছে তেমনি বনগাঁ কৃষ্ণগঞ্জে তৃণমূলকে জিতিয়েছে। উল্টোদিকে হিন্দু ভোটদাতারা সঙ্ঘবদ্ধ নয়। হিন্দু ভোট বিজেপি এবং সিপিএম দলের প্রার্থীদের মধ্যে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই জেনেও তাঁরা ভোট দিয়েছেন। বরং বলা ভাল যে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান ভোট জেনেশুনে নষ্ট করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণ শুরু হয়েছে। চার বছর আগে এই মেরুকরণ হয়েছিল তণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে। পারিণামে তৃণমূল রাজ্যে প্রথম ক্ষমতা দখল করেছিল। এবার

গূঢ় পুরুষের কলম

মেরুকরণ হচ্ছে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ মুসলমান ভোটদাতা তৃণমূলে আস্থা রাখবে। মমতা তা জানেন বলেই হিজাব পরে রমজান মাসে ইফতার পার্টিতে ঘোরাফেরা করেন। সঙ্ঘবদ্ধ মুললমান ভোট তৃণমূলের প্রাণ ভোমরা। তবু বলছি আগামী বছরে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রভাবে কংগ্রেস এবং সিপিএমের ভোট অনেকটাই কমবে। এই ভোট অবশ্যই বিজেপি-র পক্ষে যাবে। তবে এই মেরুকরণকে ত্বরান্বিত করতে বিজেপি-র কর্মীদের কোমর বেঁধে মাঠে নামতে হবে। দুর্ভাগ্য সেই চেষ্টায় যথেষ্ট খামতি দেখা যাচ্ছে। গত লোকসভার ভোটে এই রাজ্যে বিজেপি ৮৪ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। এই ৮৪ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে ৭০ লক্ষকে বিজেপি-র প্রাথমিক সদস্য করা যেতে পারতো। কিন্তু সম্ভব হয়নি। এখনও পর্যন্ত রাজ্য বিজেপি-র সদস্য সংখ্যা মাত্র ২০ লক্ষ। অথচ সদস্যভুক্তির টার্গেট হচ্ছে ১ কোটি। হাতে সময় মাত্র এক বছর। ঠিক এখানেই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। দলের রাজ্য-নেতৃত্ব দাবি করছেন যে বিশেষ একটি নম্বরে মিস্‌ড কল করলে বিজেপি কর্মীরা ইচ্ছুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই নয়া প্রযুক্তিকে একটুও খাটো না করে বলছি যে কতজন এইভাবে মিস্‌ড কল দিয়ে নিজের তাগিদে সদস্য হতে চাইবেন? বাংলার প্রতিটি গ্রামের মানুষের প্রত্যেকের কাছে একটি করে মোবাইল ফোন থাকবে এমন চিন্তা বাতুলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। গ্রামের অনেক পরিবারে সবার জন্য একটি মাত্রই মোবাইল ফোন থাকে। যেহেতু একটি নম্বর থেকে মাত্র একজনই সদস্য হতে পারেন তাই পরিবারের অন্য সদস্যরা চাইলেও বিজেপি-র সদস্য হতে পারছেন না। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এইভাবে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না। দলের বুথ কমিটির কর্মীদের সক্রিয় হতে হবে। এই কর্মীরা জানেন তাঁদের এলাকায় কতজন বিজেপি সমর্থক আছেন। এই সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দলীয় সদস্যভুক্তির ফর্ম ভর্তি করাতে হবে। তবেই কাজ হবে। একটা সময়ে রাজ্যে বিজেপি-র সমর্থনের জোয়ার এসেছিল। কোনো কারণে সেই জোয়ারের টান আর তেমন নেই। কেন? এই প্রশ্নটি নিয়ে বিজেপি রাজ্য-নেতৃত্বকে ভাবতে হবে। তৃণমূলের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে গেলে সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৭৫ লক্ষ করতেই হবে। লোকসভার নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপি-র সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার। এখন ২০ লক্ষ। তাতে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগলে আসন্ন নির্বাচনে ডুবতে হবে। ■

দিদির বাড়ি যামু, ইলিশ ভাজা খামু

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

শুভ বসন্ত। আপনারা আজকাল শুনছি দিদি বিরোধী হয়ে উঠছেন। কেন যে হচ্ছেন জানি না! আপনাদের আক্কেল ফেরাতেই আমার এই চিঠি। আপনারা আসলে এখনও দিদিকে চিনতে পারলেন না। দিদির সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের পর সত্যিই আমি বুঝলাম 'দিদিই পারেন'। দিদি একাই পারেন। এমন ক্ষমতা আর কারোর নেই। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করে দিয়ে চলে এলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন এবার বাঙালির সব থেকে বড় সমস্যা 'পদ্মার ইলিশের অভাব' তিনি মিটিয়ে দেবেন। দেবেনই। দিয়েওছেন।

দিদিই পারেন

নিজের দলের অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। বসন্তেই মুকুল ঝরে পড়ছে। এত জয় তবু ভয় কাটছে না। রবি ঠাকুরের কবিতা তুলে বলতে ইচ্ছে করে— 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না?' এই পরিস্থিতিতেও তিনি ঢাকা ভ্রমণে গেলেন। সপার্ষদ। লুক আউট নোটিস জারি হওয়া শিল্পহীন শিল্পপতি থেকে গুণগ্রাহী গায়ক, অভিনেতা, সাংবাদিকদের নিয়ে কদিন ওপার বাংলা ঘুরে এলেন। অমর একুশে পালনে একটাই খুঁত রয়ে গেল— কবির সুমনটা গেল না।

দিদিই পারেন

রাজ্যে অনেক কিছুই বাড়ন্ত। মেলা মোচ্ছব করে করে ভাঁড়ারও শূন্য। কিন্তু সামনে ইলিশ মরসুম। তখন একটা ইলিশ পার্বন না হলে কি হয়! তাই তো দিদির ইলিশ সফর। পাশের দেশ বুঝতেও পারল না, যে বাংলার আর কোনো সমস্যা আছে। বুঝল একটু ইলিশের ঝোল পেতেই বাঙালির নাল-ঝোল পড়ছে। সীমান্তে গোরুপাচার, অনুপ্রবেশ, জঙ্গিপনা সব ভুলে যাবে এক পিস ইলিশ পেলে। এমনকি তিস্তার জলও চাহিদা মতো দিয়ে দেওয়া যাবে যদি একটু মাছ পাওয়া যায়। ইলিশের বিরহে বাঙালির প্রাণ ওষ্ঠাগত। পদ্মার না হলে তিস্তার ইলিশেও চলবে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে তো তিনি সরাসরি বলেছেন, ইলিশ মাছ আটকে রেখেছেন কেন? আমরা খেতে পাচ্ছি না।

দিদিই পারেন

ওপারের শিল্পীদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় দিদি বলেন, তিস্তা নিয়ে ভাববেন না। আপনাদের সমস্যা আছে জানি। কিন্তু ওসব আমি হাসিনার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেব। একটি দেশের সফরে গিয়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রীকে এমন ঘরোয়া নামে তিনি ছাড়া আর কে ডাকতে পারেন? বিদেশের মাটিতে নিজের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নিন্দা করতে তিনিই পারেন। হতে পারে সেটা বিগত সরকার এবং সেই সরকারের তিনিও অংশীদার ছিলেন, তবু গলা কাঁপে না শুধু দিদিরই। বলেছেন, মনমোহন সরকারের পক্ষে তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। এবারও নাকি ব্যাগ গোছানোর সময় ভয় ছিল। মোদি সরকার যে ভুল বোঝায়নি সেটা তিনিই বুঝিয়ে দিতে পারেন।

দিদিই পারেন

এতদিন দিদি তিস্তার জল নিয়ে সমস্যা মেটাতে আগ্রহ দেখাননি। এতদিন ছিটমহল হস্তান্তর নিয়ে তিনি সদর্থক ভূমিকা নিতে পারেননি। কিন্তু বর্ধমানে বিস্ফোরণের পর যখন তাঁর দলের এক সাংসদের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতায় মদতের অভিযোগ উঠেছে তখন তিনিই বুঝিয়ে দিতে পারেন যে কোণঠাসা হলে তিনিও সদর্থক হতে পারেন। সংখ্যালঘু তোষণ ভুলে রামায়ণের উল্লেখ করে তিনিই বলতে পারেন, রামের সেতু বন্ধনের মতো তিনিও কাঠবেড়ালির ভূমিকা নিতে তৈরি।

দিদিই পারেন

তিনি যে উন্নয়নের চেয়ে মেলা মোচ্ছব বেশি পছন্দ করেন সেটা বিদেশ সফরে গিয়েও তিনিই বুঝিয়ে দিতে পারেন। তাই তো একটা গোটা সন্ধ্যা তিনি সেখানে গান বাজনা করে কাটিয়ে দিয়েছেন। সে আবার এক কাণ্ড! সত্যি দিদিই পারেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কলকাতার ব্রিগেডে শহীদ সমাবেশে দেবকে দিয়ে পাগলু ডান্স করাতে তিনিই পেরেছিলেন। আর তারপর বাংলার শ্রদ্ধেয় কবি জয় গোস্বামীকে বলেছিলেন, জয়দা ছোট্ট করে একটা কবিতা শুনিয়ে দিন তো! এবার আরও বড় কৃতিত্ব দেখালেন দিদি। তিনিই পারেন। বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদকে বলেন, একটা গান শোনান। এরাশাদ বলেন, আমি তো গান গাই না, কবিতা লিখি, কয়েকটা বইও আছে। কবি দিদি এরপর বলেন, তাহলে কয়েকটা কবিতার নাম শোনান। এরশাদও বলে যান। সত্যি দিদি তোমার জবাব নেই।

দিদিই পারেন

দিদিই রাজ্য, দিদিই কেন্দ্র। হতে পারেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তবু কেন্দ্রের হয়ে কথাও দিয়ে এলেন তিনি। বললেন, ইতিমধ্যেই স্থলসীমান্ত চুক্তিটি নিয়ে বিতর্ক মিটিয়ে দিয়েছি। রাজ্যসভায় সরকার শীঘ্রই বিলটি পাশ করিয়ে নেবে। ছিটমহলবাসীদের পুনর্বাসন প্যাকেজটি এখন দেখা হচ্ছে। এটা একটা বড় কাজ হয়ে গেল। মুখের কথায় তিনি যেমন শিল্প গড়েন, সিঙ্গুরে জমি ফিরিয়ে দেন, ঠিক তেমনই আন্তর্জাতিক সমস্যাও সমাধান করে দিলেন। কেয়াবাৎ।

—**সুন্দর মৌলিক**

দিল্লী বিধানসভার নির্বাচন : মন্দের ভালো হয়েছে

এন. সি. দে

যে দলটি মাত্র কয়েক মাস আগেও প্রতিটি রাজ্যের নির্বাচনে গোহারান হেরে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের তক্‌মা হারাতে বসেছিল; যে দলের নেতাদের নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, সেই দলই দিল্লীর বিধানসভা নির্বাচনে দু-দুটি বৃহৎ জাতীয় দলের রাজ্যপাঠই চুকিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস তো বিধানসভায় ঢুকতেই পারে না; আর বিজেপি-র তিনটি প্রদীপ আপ-ঝড়ে কতক্ষণ জ্বলবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? বিজেপি-তে আজকাল যাদের গ্রহণ করা হয়, তাদের আদর্শ যাচাই করা হয় না। তাই তাদের যাওয়ার ব্যাপারটাও যে আদর্শসম্মত হবে না তা বলাই বাহুল্য।

তবে এটা ভারতীয় গণতন্ত্রেরই মহিমা। এখানে বিপ্লব নীরবেই হয়, তার জন্য রক্তপাত ঘটাতে হয় না। যেমনটি হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান-সহ মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলিতে। এখানে কোনো দল বা ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ চিরস্থায়ী নয়। আজকে যে উপেক্ষিত, কাল সেই সাদরে গৃহীত। কাল যে ছিল সমাদৃত, আজ সে-ই অনাদৃত। সবটাই কর্মফল। আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মদমত্ত হয়ে দেশবিরোধী, জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করলে হিন্দুস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আপাত-নিরীহ মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে কখনই দ্বিধা করে না। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ শুধু তার ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়, তার দেশ, তার রাষ্ট্র, তার অর্থনীতির প্রতিও রয়েছে

> **সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবহীন জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় পুঁজির বিকাশ করতে হবে ধীরে; জাতীয় শিল্পের রক্ষায় ভরতুকির ভূমিকা অপরিসীম। উন্নত দেশগুলো তাদের শিল্প-কৃষিকে রক্ষা করতে অকাতরে ভরতুকি দেয়, তারাই আবার আমাদের দেশকে ভরতুকি তুলে দিতে নির্দেশ দেয়।**

রাষ্ট্রহিত, শিল্পহিত ও শ্রমিকহিত জাতীয় স্বদেশী দৃষ্টিভঙ্গি।

লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী তাঁর বেশ কয়েকটি কাজের ফলে কর্পোরেট লবির একজন একনিষ্ঠ সেবক হয়ে পড়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-পুঁজিবাদের দালাল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলির ভাড়াটে অর্থনীতিবিদগণ প্রতিনিয়ত নরেন্দ্র মোদীকে ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারের একমাত্র কাণ্ডারি বলে বলে সুকৌশলে সংস্কারের ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টায় আইন রাজ্যসভায় পাশ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের শুভ প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে না এগিয়ে তড়িঘড়ি অর্ডিন্যান্সের পথ ধরেছেন। যে কাজের জন্য নিজের দলই আগে বারে বারে কংগ্রেসকে ধিক্কার জানিয়েছে। একজন রাষ্ট্রনেতার চরিত্রে এই ধরনের অধৈর্যপনা থাকা ঠিক নয়। মোদীজী ভেবেছিলেন অর্ডিন্যান্স করে আইন পাশ করে এখন তো সংস্কারের চ্যাম্পিয়ন হই, ছয় মাস বাদে বাদবাকি রাজ্যগুলি জয় করে নিলেই রাজ্যসভায় এসে যাবে ঈপ্সিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা; ব্যাস তাহলেই বাজিমাত। দিল্লী বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফলে তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে গিয়েছে।

এটা মন্দের ভালই হয়েছে। এর থেকে নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দল যে শিক্ষা নেবে রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে। কেজরিওয়ালও ভালো লোক নন। তিনিও কর্পোরেট লবির লোক। তিনিও প্রাক্তন আমলা, তার পার্টিও আম আমলা পার্টি। কিন্তু তিনি মাত্র একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে সীমিত। রাষ্ট্রের ক্ষতি করার ক্ষমতা তাঁর নেই। যেটা একজন প্রধানমন্ত্রীর আছে। মোদীজী হয়ত ভেবেছিলেন সংস্কার একটি আলাদীনের প্রদীপ, যা থেকে শুধুই বেরিয়ে আসে হীরে-জহরত, কিন্তু তা থেকে যে ভূতও বেরিয়ে আসে তা তিনি জানতেন না। তার সংস্কারের ভূত এই কেজরিওয়াল।

ভারতীয় দর্শনে 'সংস্কার' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি একটি শুভসূচক শব্দ। এর প্রভাব জন্ম-জন্মান্তরের। শুভ চর্চা, শুভ আচার-আচরণ, শুভ কর্মফলের অধিকারীকে হিন্দু দর্শনে একজন সংস্কারিত মানুষ বলে মনে করা হয়। মানুষের কল্যাণকারী কার্যকে বলা হয় সংস্কার। কিন্তু বিশ্ব পুঁজিবাদ তাদের অধীনস্থ সংস্থা ডব্লু.টি.ও.-র মাধ্যমে সুচতুরভাবে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতি কবজা করার লক্ষ্যে এই নয়া চাল চেলেছে। এর পোশাকি নাম দিয়েছে 'অর্থনৈতিক সংস্কার কমসূচি'। যে দেশের রাষ্ট্রনেতা ও তাঁর দল এই তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচি

সামগ্রিকভাবে নিজেদের দেশে প্রয়োগ করেছে, তারাই জনরোষের শিকার হয়েছে। দেশে দেশে মানুষ ডব্লু.টি.ও.-র বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। আমাদের দেশেও ২০০২ সালে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ডব্লু.টি.ও. 'তোড়ো, সোড়ো, ছোড়ো' ডাক দিয়ে বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। তার পরিণামে বিজেপি-কে দেশের জনগণ পরপর দু'টি লোকসভা নির্বাচনে (২০০৪ ও ২০০৯) প্রত্যাখ্যান করেছিল। আজকের বিজেপি নেতৃবৃন্দ কী সেকথা ভুলে গেছেন? ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাওয়ের কংগ্রেস সরকারই এই নয়া অর্থনীতি ও শিল্পনীতির প্রবর্তন করেছিল। তখন সেই সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং সংস্কারের তেতো পিল খাওয়াতে শুরু করেছিল। স্বপ্ন দেখিয়েছিল এখন তেতো খান ভবিষ্যতে শুধুই মিঠা পিল খাওয়াবো। আজও দালাল অর্থনীতিবিদরা সেই সংস্কারের তেতো পিল খাওয়ানোর কথাই বলে যাচ্ছে। হিন্দুত্ব মার খেয়েছে তাতে, তারা মনে মনে উল্লসিত হলেও, নরেন্দ্র মোদীর সংস্কারের নেশা না ছুটে যায় তাতে তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি সংস্কার হলো খাল কেটে কুমির ডেকে আনা। কংগ্রেস সরকার আমাদের দেশকে ডব্লু.টি.ও.-তে সামিল করার পর থেকে দেশের আর্থিক স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে; দেশ ক্রমশই সাম্রাজ্যবাদীদের শিকার ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক শ্রম কমিশন (আইএলও)-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতে ১৯৯৯-২০০০ বর্ষে প্রথাগত চাকরিতে নিযুক্ত ছিল ৯ শতাংশ মানুষ, ২০০৯-১০ বর্ষে এই কর্ম-নিযুক্তি কমে দাঁড়ায় ৭ শতাংশে। কৃষির বাইরে অপ্রথাগত কর্মে নিযুক্তির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৩.৬ শতাংশ। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কাজেও বেকারত্ব বাড়ছে অতি দ্রুত, বিশেষ করে মহিলাদের। ২০১৩ সালে কংগ্রেস সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের এক রিসার্চ পেপারেও প্রকাশিত হয়েছিল যে, বহুকথিত সংস্কারের পরিণাম আজ শুধুই কর্মচ্যুতি ও ক্যাজুয়াল লেবারের সংখ্যাবৃদ্ধি। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র থেকে থেকে উৎখাত হয়েছে দেড় কোটি মানুষ, সারা দেশের কর্মনিযুক্তিতে কৃষির অবদান ৫৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৫৩ শতাংশ। ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে হয়ে গেছে নির্মাণ শিল্পের ক্যাজুয়াল লেবার। ২০১০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষে, যার চার কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিক অপ্রথাগত কাজে নিযুক্ত হওয়ায় এরা সমস্তরকম সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। এই সময়কালে উৎপাদন শিল্পে কাজ হারায় ৫০ লক্ষ মানুষ; সার্ভিস সেক্টরে কর্মনিযুক্তি এক কোটি আশি লক্ষ থেকে কমে হয় মাত্র ৪০ লক্ষ।

আর একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রতি তিনজন ভারতীয়র মধ্যে দুইজনই আজ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। এদের সামাজিক সুস্থিতি বলে কিছুই নেই। প্রতি তিনজন নারী ও শিশুর মধ্যে একজন (৫ বছরের নীচে) অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং কম ওজনের। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব উন্নয়ন মান অনুযায়ীও ভারতে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কোনো উন্নতি ঘটেনি। ১৯৮০ সালে যা ছিল এখনও তাই রয়েছে।

উল্টোদিকে, ২০১৪ সালে প্রকাশিত অক্সফাম রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারতে সম্পদ বণ্টনে অসাম্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ১০ শতাংশ ধনী দেশের সম্পদের ৩০ শতাংশ ভোগ করছে। এইভাবে চললে ২০১৯ সালের মধ্যে ৯ কোটি মানুষের কপালে জুটবে চরম দারিদ্র্য। ডব্লু.টি.ও.-র কল্যাণে আজ বিশ্ব জুড়ে মানুষের জীবনে শুরু হয়েছে চরম অসাম্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্ব জুড়ে দারিদ্র্যের অন্ধকারে আজ ২৩০ কোটি মানুষ। বিশ্বের ধনীতম ৮৫ জন মানুষের হাতে চলে গেছে বিশ্বের অর্ধেক সম্পদ। এই সুপার ধনীদের দৈনিক আয় চার হাজার কোটি টাকা। এই হিসাব গত বছরের মার্চ পর্যন্ত। ২০১৬ সালের মধ্যে মাত্র এক শতাংশ ধনীর হাতে চলে যাবে বাদবাকি বিশ্বের সম্পদ।

দিল্লী বিধানসভার ফলাফল বোঝাতে এত লেখার দরকার ছিল না। লিখতে হলো শুধু এটুকু বোঝানোর জন্য যে তথাকথিত আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে যে দল বা নেতা চলবে তারাই জনগণের রোষের কবলে পড়বেই। কারণ এই সংস্কার জনস্বার্থে নয়, রাষ্ট্রের স্বার্থে নয়, জাতীয় শিল্পের স্বার্থে নয়, এ সংস্কার কেবল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিকাশের স্বার্থে। বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর মাথা থেকে এই ভূত যত তাড়াতাড়ি নামে, ততই দেশের মঙ্গল। সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবহীন জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় পুঁজির বিকাশ করতে হবে ধীরে; জাতীয় শিল্পের রক্ষায় ভরতুকির ভূমিকা অপরিসীম। উন্নত দেশগুলো তাদের শিল্প-কৃষিকে রক্ষা করতে অকাতরে ভরতুকি দেয়, তারাই আবার আমাদের দেশেকে ভরতুকি তুলে দিতে নির্দেশ দেয়। কারণ নিয়ন্ত্রণহীন বাজারদরে তাদের রমরমা ব্যবসা। ৪০০ টাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করতে তারা এদেশে তেল ও গ্যাসের ব্যবসা করতে আসবে না। তারা চায় যখন যা খুশি দামে বিক্রি করার লাইসেন্স। ভরতুকিহীন তেল-গ্যাসের ব্যবসায়ে ঢুকলে দু-দিনে ইন্ডিয়ান ওয়েল লাটে উঠবে। তারপর এরা একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারে গ্যাসের দাম কত হাজারে তুলে আনবে তা এদেশের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা ধরে রাখতেই হবে। কারণ তাঁর পিছনেরই রয়েছে হিন্দুত্বের আশ্বাস। হিন্দুত্ব রক্ষায় একজন রাজনৈতিক কাণ্ডারি তো চাই, তা নাহলে ইমামের ডাকে শুধু মুসলমান সমাজ নয়, সমগ্র রাজনৈতিক দল এক হয়ে যাবে। যেমনটি হয়েছে কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে। এটি হিন্দু সমাজের জন্য একটি অশনি সংকেত। সংস্কারের ভূত ঝেড়ে ফেলে নরেন্দ্র মোদীকে এখন জনকল্যাণমূলক কাজে মন দিতে হবে। ওবামার সঙ্গে ঢলাঢলিতে নয়। হোক দালাল অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা। তাদের ভোটে তো নির্বাচন জেতা যাবে না। নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন জনগণের আস্থা। এটা অর্জন করতেই হবে। তা নাহলে হিন্দুত্বের চরম শত্রুরা আবার ক্ষমতায় চলে আসবে। ■

দোল উৎসব ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

'নীল দিগন্তে...ওই ফুলের...আগুন' ঝরিয়ে বছর বছর আসে দোল! রঙের উৎসব দোল। অনেক সময় মনে হতে পারে, এই দোল বা হোলি, একটা বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে হয়তো একদিনের একটা রুটিন রঙ-মাখামাখি, আবির ছোঁড়াছুঁড়ি, একটু নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া। ব্যাস ফুরিয়ে গেলো! কিন্তু সত্যিই কী তাই? আপাত দৃষ্টিতে অনেকটা এরকম মনে হলেও, এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ধনী-দরিদ্র, জাত-পাত সমস্ত রকম ভেদাভেদ, রেষারেষির ঊর্ধ্বে উঠে দোল উৎসবের কেন্দ্রে কিন্তু রয়েছে এক চিরন্তন সর্বজনীন মিলন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ্‌তে স্প্যানিস ফর্কের শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে দোল উৎসব। (২০১৩)

আকুলতা— মানুষের সঙ্গে মানুষের! যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের এক বাসন্তিক রঙিন আবহে, অত্যাশ্চর্য রঙ বিনিময় চলে মনের সঙ্গে মনের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষেরও। কারণ, জীর্ণ পুরাতনকে সময়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বসন্তে প্রকৃতি যখন নতুন সাজে সেজে ওঠে তখন তার ছন্দে তাল মিলিয়ে এ এক অসাধারণ 'মাস সেলিব্রেশন' বা গণ উদ্‌যাপন। গোটা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যার জুড়ি মেলা ভার। যার রেশ চলে একরকম বছর জুড়ে!

কিন্তু কবে শুরু হয়েছিল এই উৎসবের? সঠিক জানা যায় না। যদিও জৈমিনির 'পূর্ব মীমাংসাসূত্র' এবং অন্যান্য কিছু প্রাচীন রচনায় দোলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন আর্যদের মধ্যে হোলির প্রচলন ছিল। পূর্ব ভারতে হোলির বিশেষ প্রচলন ছিল। খৃষ্ট-জন্মের বেশ কয়েক শতক আগেও হোলির ভালো প্রচলন ছিল বলে জানা যাচ্ছে। তবে অনেকটা পিছিয়ে গেলে পুরাণের কাহিনি কিন্তু একটু অন্যরকম। বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে উচিত শিক্ষা দিতে তার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর নির্দেশে, পুত্রকে নিয়ে একবার জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করে হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকা। কথিত আছে যে, বিশেষ কারণে, ওই আগুন থেকে নাকি কোনোরকম ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না হোলিকার। অন্যদিকে, পুড়ে যাওয়ার কথা ছিল প্রহ্লাদের। কিন্তু দাউ দাউ আগুন থেকে রক্ষা পায়নি 'অশুভ'-র প্রতীক এই হোলিকা। অথচ 'শুভ'-র প্রতীক প্রহ্লাদ ওই জ্বলন্ত আগুন থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসে! অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির চিরন্তন জয়— 'হোলিকাদহন'-এর এই প্রতীকী পৌরাণিক উপাখ্যান এবং 'হোলিকা' শব্দটি থেকে আজকের 'হোলি' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ ভারতে হোলিকা দহনের পরিবর্তে, শিবের তপস্যা ভাঙাতে গিয়ে কামদেবের ভস্ম হয়ে যাবার ঘটনা বা 'কাম দহনম্'-এর বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়। উত্তর ভারতে অনেক জায়গায় রাধাকৃষ্ণের কাহিনিও হোলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে, শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসে পুতনা রাক্ষসীর মৃত্যুর ঘটনা। আবার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃস্টাব্দে) জন্মদিন উদযাপন করা হয় হোলি বা দোল পূর্ণিমার দিনে। এমন নানা বিষয়, 'মিথ' ও পৌরাণিক কাহিনি যুক্ত হয়েছে 'হোলি'-র সঙ্গে।

কারণ, ভারতের অন্যতম প্রাচীন উৎসব এই হোলি। রামগড়ে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সালের একটি শিলালিপিতে এই উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ রয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্ধনের লেখা 'রত্নাবলী' নামক গ্রন্থে। হোলির উল্লেখ পাওয়া যায় বিখ্যাত মুসলমান পরিব্রাজক আলবেরুনি-র বিবরণে। পরবর্তীকালে 'হাম্পি'-র ভাস্কর্য, আহমেদনগর ও মেবারের চিত্রকলা ইত্যাদিতে 'হোলি' উদযাপনের নানা চিত্র উঠে এসেছে। এই সমস্ত ঐতিহাসিক

সূত্রগুলি থেকে জানা যায় দূর অতীত থেকে সাম্প্রতিক অতীতে— খুব ধুমধাম করেই ভারতবাসী মেতেছে, মিশেছে প্রাণের উৎসবে, পরস্পরকে কাছে টেনেছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে। আর এটাই কিন্তু হোলির মূল 'স্পিরিট', যা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

হোলির এই তুখোড় স্পিরিটকে কিছুটা ধরে রাখছে হোলির অনন্য কিছু অনুষঙ্গ। যেমন রঙ, পিচকারি, আবির, সাজ-পোশাক, ঢোল, গান, নাচ, মিষ্টি ইত্যাদি। এক সময় হোলির রঙে ব্যবহার করা হোত হলুদ, চন্দন, বিভিন্ন ফুল ও পাতার নির্যাস, যা ছিল ১০০ শতাংশ প্রাকৃতিক। হোলির সময়ে ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এগুলির ব্যবহার ত্বকের স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই যথেষ্ট উপযোগী ছিল। আবার ঋতু পরিবর্তনে গরমের সূচনায় মানুষের আলস্য আসে, ঘুম-ঘুম পায়। হোলির সময় চেঁচিয়ে কথা বলে, গান-বাজনা এবং প্রচুর মজা করে মানুষ এই আলস্য ভাবকে প্রতিহত করে। হোলি প্রকৃতপক্ষে মানুষের শরীরতন্ত্রে এইভাবে 'নূতন যৌবনেরই দূত' হিসাবে দেখা দেয়! যাই হোক, অনেক জায়গায় হোলির প্রাক্ সন্ধ্যায় প্রতীকী 'হোলিকা দহন' হয়। পোড়ানো হয় অশুভ হোলিকার ঘর। হোলিকা দহনের এই প্রস্তুতিতে পুরনো কাঠ-কুটো-সহ এলাকার আবর্জনা অনেকাংশে পরিষ্কার হয়। আগুনের চারপাশে সারিবদ্ধভাবে প্রদক্ষিণ ও হোলির গানে পারস্পরিক সম্প্রীতির ভাব জাগে। আর এই সম্প্রীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেয় হোলির দিনে দেশীয় নানা মিষ্টি ও পানীয় সহযোগে অতিথি আপ্যায়ন এবং পারস্পরিক উপহার বিনিময়। প্রসঙ্গত, হোলি উপলক্ষে বাড়তি উদ্দীপনার সঙ্গে ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়। এই আবহে একদিকে যেমন ক্ষতিকর জঞ্জাল, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির বিনাশ হয় তেমনি অন্যদিকে নির্মল, সুস্থ গৃহ-পরিবেশে মানুষের মনে প্রচুর পরিমাণে 'পজিটিভ এনার্জি' বা ইতিবাচক শক্তি ও ইচ্ছার সঞ্চার হয়। আবার পরম্পরাগত পোশাকে লোকসঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সহযোগে স্থানীয়ভাবে পথ পরিক্রমা মানুষের মনে এক বিশুদ্ধ আনন্দের ও একতা ভাবের জন্ম দেয়।

সাধারণভাবে হোলি পালিত হয় দু'দিনে। তবে ভারতের নানা প্রান্তে হোলি উদযাপনের নানারকম পার্থক্য রয়েছে। মণিপুরে ৬ দিন ধরে, উত্তরপ্রদেশের কানপুরে ৭ দিন ধরে, বৃন্দাবনে ১৬ দিন ধরে এবং গোয়ায় বসন্ত উৎসবের একটি অঙ্গ হিসাবে প্রায় ৩০ দিন ধরে হোলি উৎসব পালিত হয়! এছাড়া, গুজরাট, উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন, হরিয়ানা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের জয়সলমীর ইত্যাদি অঞ্চলে বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে হোলি উদ্‌যাপিত হয়। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে গঙ্গামেলা বা হোলিমেলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রচুর মানুষ অংশগ্রহণ করে। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে হোলির দিনটিকে বছরের সবথেকে সুখের ও বর্ণময় দিন হিসাবে মানা হয় এবং মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রসারে কাজে লাগানো হয়। অন্যদিকে, হোলির হরেক রঙ উড়ে বাতাসে মিশে ছেয়ে ফেলে রাজস্থানের জয়সলমীরের আকাশ, চারদিক মুখরিত হয় বিশেষ রাজস্থানি সংগীতে। আর গুজরাটে হোলির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও নৃত্যগীত-সহ লোকনাট্যের উপস্থাপন আকর্ষণ করে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের হৃদয়। উত্তরপ্রদেশের মথুরা, বৃন্দাবন, হাথরাস, আগ্রা ইত্যাদি জায়গায় পরম্পরাগত পোশাক ও উপাচারের ব্যবহার, উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন অঞ্চলে হোলির গানে ভারতীয় মার্গ সংগীতের বিস্ময়কর প্রয়োগ, বিহারে রঙ, কাদা ও হোলির গানের বিচিত্র সমন্বয় ফাগোয়া উৎসব, পশ্চিমবঙ্গে বর্ণময় দোলযাত্রা ও শান্তিনিকেতনে বিশেষ সংগীতের আবহ, মহারাষ্ট্রে হোলি উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে পুরনো শত্রুতা ভুলে নতুন সম্পর্কের সূচনা, মণিপুরে ৬ দিন ব্যাপী হোলির শেষ দিনে বিশেষ শোভাযাত্রা এবং নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ওড়িশায় রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে জগন্নাথদেবকে ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা ইত্যাদি ভারতীয় হোলি উৎসবের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক।

তবে ভারতের বাইরেও যেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা রয়েছেন বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে রয়েছে সেখানে হোলি উদযাপিত হয় বেশ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গেই। এই কারণেই নেপাল, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, গিয়ানা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সুরিনাম, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাশ, ফিজি, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হোলি উৎসব পালিত হয়। নেপালে হোলি বা 'ফাগু' জাতীয় উৎসব হিসাবে পালিত হয়, অংশগ্রহণ করে প্রায় সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন। হোলির দিনটি নেপালে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবেও পালিত হয়।

সুতরাং, দেশ-কালের সীমারেখা একরকম পেরিয়ে পৃথিবীর একটি বিরাট অংশে হোলির আবেদনে, হৃদয়ের আমন্ত্রণে মানুষ সাড়া দিয়ে চলেছে বছরের পর বছর। তার কারণ, হোলি মানে নিছক রঙ দেওয়া-নেওয়া নয়, হোলি নিছক ধর্মীয় উৎসবও নয়, হোলি সমস্ত মানুষকে এক বিশুদ্ধ আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ততার মঞ্চে টেনে আনতে সক্ষম। সেখানে মানুষ সমস্ত ধরনের সংকীর্ণতাকে ভুলে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে, সম্মান জানাতে পারে, বিশুদ্ধ আনন্দ পেতে পারে, বিশুদ্ধ আনন্দ দিতে পারে। চারদিকে বড্ড অবিশ্বাস, সংকীর্ণতা ও হিংসার পরিবেশ। সবাইকে নিয়ে আনন্দ করতে আমরা বোধহয় ভুলে যাচ্ছি। ক্রমশ সরে যাচ্ছি মাটির থেকে দূরে। যদিও ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্য, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার উৎসবে সকলকে সাদর আবাহন জানায়। তাই আসুন, আমরা ছড়িয়ে দিই হোলির বার্তাকে, পরস্পরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি বছরভর নানা উৎসবের আঙিনায়। সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের রঙিন বার্তা ছড়িয়ে যাক দিকে দিকে।

(লেখক নাইকুলি দেশবন্ধু বাণীমন্দিরের সহ-শিক্ষক)

ভোটব্যাঙ্ক নয়, সামাজিক মিলনের পটভূমি হয়ে উঠুক দোল

সারথি মিত্র

পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে একটা খুব গর্ব ছিল আমাদের। বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের মতো জাতপাতকেন্দ্রিক ভোট আর যাই হোক আমাদের এখানে হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিকতম বনগাঁর উপনির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই গর্ব করা পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের আর সাজে না। আরও একটি সচেতন প্রশ্ন, আমাদের গর্বের যে কোনো কারণ কেবল 'পশ্চিমবঙ্গবাসী' হিসেবে হবে কেন? 'ভারতবাসী' হিসেবে হবে না কেন? বৈচিত্র্যের মাঝে মহান ঐক্যকে স্বীকার করে নেওয়ার পরও এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাত্যভিমান, ছোটো ছোটো প্রাদেশিকাভিমান কোথাও যেন ভারতবাসী হিসেবে আমাদের চেতনাটাকে ব্যাহত করেছে। প্রাদেশিক ঐতিহ্য আমাদের অবশ্যই গৌরবান্বিত করবে, কিন্তু তার জন্য অন্য প্রদেশকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে হবে এমন কী মানে রয়েছে? আজ যাদের গো-বলয় বলে আমরা কটাক্ষ করি বর্তমানে আমাদের

রাজনীতিতে গুণ্ডাবৃত্তি, জাত-পাত-কেন্দ্রিকতা তাদেরই সমকক্ষ। এই সামাজিক ভেদরেখা মোছাতে কিছু সমাজ-সচেতন সংগঠন বিভিন্ন দিনে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু ভেদাভেদের যে শেকড় সমাজের ভিত্তিমূলে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, এক ধাক্কায় তাকে উপড়ে ফেলা কি এতই সহজ? এই প্রেক্ষিতে দোল— কতটা কার্যকর হতে পারে তা আমাদের সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা ভেবে দেখতেই পারেন। একটা সময় ছিল যখন বিবেকানন্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা সামাজিক অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই অভিশাপ একবিংশ শতাব্দীতে একেবারে বিলুপ্ত না হলেও তার প্রভাব যে অনেক কম তা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু সেই অভিশাপের দায়ভার যে ভারতবর্ষ এখনও বহন করে চলেছে তাও সত্য। যদিও পরিস্থিতিটা ঘুরেছে খানিক অন্য দিক দিয়ে। মোড় ঘোরার শুরু বৃটিশ আমলেই। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ভারতীয় আইন-সভায় দলিত, মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো- ভারতীয় এবং ইউরোপিয়ানদের জন্য সভ্যপদ সংরক্ষণ করে দেন। তপশিলি জাতি (সিডিউলড কাস্ট) ব্যাপারটাও তাদেরই আমদানি। কিছু তথাকথিত নিচু জাতকে এর আওতায় এনে তাকে বিশেষ সুবিধে পাইয়ে দেবার বিভেদমূলক রাজনীতি। যার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' খ্যাত কিংবদন্তী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সেই সমস্ত জাতের অন্তর্গত মানুষদের উদ্দেশে বলেছিলেন যে একদিকে ভারতীয়েরা তাঁদেরকে নিচু জাত বললে তারা তার প্রতিবাদ করে, অন্যদিকে বৃটিশদের দেওয়া নিচু জাতের শিরোপা তারা অম্লানবদনে গ্রহণ করছে। কিছু জাতি তাদের তপশিলি জাতি-র অন্তর্ভুক্তিকরণ থেকে দূরে সরিয়ে নিলে রামানন্দবাবু এদের প্রশংসাও করেন। এইভাবে 'ফরোয়ার্ড' এবং 'ব্যাকওয়ার্ড' ক্লাস ব্যাপারটা আমাদের মাথায় গেঁথে দিয়ে আসলে বিষবৃক্ষ রোপণের কাজটাই করে দিয়ে গিয়েছিল বৃটিশ।

সমাজের যে অংশ পিছিয়ে পড়েছে তাকে তুলে আনা অবশ্যই এক দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু সংরক্ষণই তার একমাত্র দাওয়াই নয়। কারণ সংরক্ষণের সুবিধা সবাই ভোগ করতে পারেন না। আর একটা গোটা জাত-কে বিশেষ সুবিধে দিতে গিয়ে আমরা আর্থিক অগ্রসর অনগ্রসরতার বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছি। ফলে গলদটা রয়ে গিয়েছিল গোড়াতেই। দ্বিতীয়, ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে অনুধাবন করার ইচ্ছে এবং ক্ষমতা কোনোটাই ছিল না। তাদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ লক্ষ্য ছিল যেনতেন প্রকারণে শস্য-শ্যামলা-উর্বরা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা কায়েম করার। আর এর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যেটা তারা করেছিল তা হলো মেকলীয় শিক্ষাপদ্ধতি চালু করে কেরানী তৈরির কারিগর করেছিল ভারতীয়দের। আর তার চূড়ান্ত পর্যায়ে জাত-পাতের ভেদাভেদ সরাসরি পাঠ্যসূচিতে তুলে এনে বৃটিশরা দেখাতে চাইল— দেখ! ব্রাহ্মণেরা কতটা অত্যাচারী ছিল। তারা তো বাকিদের ওপর প্রভুত্ব করেছে। এভাবেই দেশের সংস্কৃতিকে যতটা পেরেছে বিকৃত করে জাতিগত যে বিষবাষ্প ভারতীয় বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল তারা, তাতে তাদের কার্যসিদ্ধি তো হয়েছেই; বরং স্বাধীনতার প্রায় সাত-দশক পরেও সেই সমস্যায় জর্জরিত ভারত। বৃটিশ শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষ কখনওই এক ছিল

না বলে যে সর্বৈব মিথ্যা প্রচার চালানো হয় তার পেছনেও ইংরেজদের এই জাতিগত বিভাজনের রণকৌশল কাজ করেছিল।

যে ভারতীয় রাজনীতি একদা সম্পূর্ণ আদর্শবাদের ওপর অধিষ্ঠিত ছিল, আজ তার এই করুণ হাল হয়েছে জাত-পাত-কেন্দ্রিক রাজনীতির জন্যই। সংরক্ষণের মাধ্যমে তথাকথিত নিচু জাতের ক্ষমতায়নের যে প্রক্রিয়া স্বাধীনতা-পূর্ব আমলে চালু হয়েছিল, ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তা একশ্রেণীর মানুষের হাতেই সীমাবদ্ধ রইল। এর সুফল কিন্তু গোটা সমাজ পেল না। উপরন্তু একদল রাজনীতিক ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। এঁরা জাত-পাতকে দেখলেন ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে। সরাসরি একে নিয়ে এলেন রাজনীতির ময়দানে। বিহারে লালুর দল কিংবা উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর দল যথাক্রমে যাদব ও দলিতদের হাতিয়ার করে রাজনীতির আসর মাত করলেন। অথচ দেখুন, খাদ্য- কেলেঙ্কারিতে লালু কোটি কোটি টাকা তছরূপ করেছেন। মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রাজ্য জুড়ে নিজের 'বহুমূল্য' মূর্তি গুলো বসিয়েছেন! সবই কিন্তু গরিবস্য গরিব যাদব ও দলিতদের টাকা লুঠ করে। বলতে পারেন এই যে যাদবরা কিংবা দলিতেরা এত আশা নিয়ে লালু বা মায়াবতীর মতো নেতা-নেত্রীদের তখতে বসান তাতে তাদের সমাজের কোন উপকারটা হলো? তাঁরা তো যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভারতে এই মুহূর্তে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষ রয়েছেন মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ আর তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ ৯ শতাংশ। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ৪১ শতাংশ। সবমিলিয়ে শতাংশের নিরিখে দেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি জনসংখ্যা অধিগ্রহণ করে আছেন এঁরা। আর রাজনীতির কারবারিরা এঁদেরকে সহজবোধ্য কারণেই তুরুপের তাস করার চেষ্টা করেন। যখন সেই প্রয়াস সফল হয়, তখন তাঁরা হিরো হন। কিন্তু সেই হিরোত্ব জিরোত্বে নেমে আসে এই ভোটব্যাঙ্ক

ভোটব্যাঙ্ক	
রাজ্য	জাতি/সম্প্রদায় (ভোটের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ)
বিহার	যাদব, মুসলমান, ভূমিহার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত
উত্তরপ্রদেশ	দলিত (মায়াবতীর সমর্থক), মুসলমান (বর্তমানে মুলায়ম-অখিলেশেরদলের সমর্থক), যাদব
পশ্চিমবঙ্গ	মুসলমান (অধিকাংশই মমতার দলে),
কর্ণাটক	লিঙ্গায়ৎ, অহিন্ডা,
তামিলনাড়ু	থেবর, বান্নিয়ার, তপশিলি জাতি
পাঞ্জাব	দলিত (বিশেষ করে আদ-ধর্মী এবং মাজাবি) জাঠ শিখ
রাজস্থান	জাঠ। বিষ্ণোই, রাজপুত, গুজ্জর
মহারাষ্ট্র	মারাঠা (৩২%), কুনবি (ওবিসি, ১৮%), ধনগার (১২%), তপশিলি জাতি (১৫%), তপশিলি-উপজাতি (৯%), মালি (ওবিসি ৮%), মুসলমান (উচ্চবর্ণ ৪%), ব্রাহ্মণ (৩%), তেলি (৩%)।

রবীন্দ্রনাথের মহাবাণী স্মরণ করে বলি— 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে।' একটা সামাজিক অনুষ্ঠান অন্তত যেন দেশের কাজে লাগে। সেই অনুষ্ঠান দোল বা হোলি হয়ে উঠুক সামাজিক মিলন ক্ষেত্রে। তবেই দেশের মঙ্গল, নচেৎ যথা পূর্বং তথা পরং।

কুক্ষিগত না হলে। একটা মোক্ষম উদাহরণ দেওয়া যাক। মায়াবতী যে তপশিলি শ্রেণীভুক্ত তা হলো জাটব। উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু জেলা রয়েছে যেমন কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গোণ্ডা, রায়বেরিলি, প্রতাপগড় বা শোনভদ্র ইত্যাদি যেখানে অন্যান্য তপশিলি জাতিগুলোর চেয়ে জাটবদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ২০০২ সালে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে শোনভদ্র জেলার প্রতিটি আসনেই হেরে যায় বহুজন সমাজ পার্টি। এই জেলায় মায়াবতীর জাটবদের সংখ্যা কিন্তু অত্যল্প। ২০০৭-এ এই ছবিটিই আমূল পালটে যায়। এইসব এলাকায় ভোটে বিপুল সাফল্য পান মায়াবতী। আবার ২০১২-র নির্বাচনে এখানে অর্ধেক আসন খুইয়ে বসে তাঁর দল। এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?

অনেকগুলো ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন, তপশিলি জাতি- উপজাতিভুক্ত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রেষারেষি। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের দেখানো মায়াবী স্বপ্নে এরা কখনও ভোলেন,

কখনও বা ভোলেন না ইত্যাদি। ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, একটা জিনিস স্পষ্ট। সমস্ত তথাকথিত নিচু জাতিকে রাজনীতির কারবারিরা এক ছাতার তলায় কস্মিনকালেও আনতে পারেননি, দ্বিতীয়ত এঁরা যে জাতের সেই জাতের কাছে এঁরা যতই কুকর্ম করুন না কেন, তা মাফ পেয়ে গেলেও অন্যান্য জাতের কাছে এদের গ্রহণযোগ্যতা কখনও কখনও তলানিতে এসেও ঠেকে। এই রেষারেষির প্রসঙ্গে একটি তথ্য দেওয়া যাক। জাঠ ও গুজ্জর— উভয় সম্প্রদায়ই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্গত। জাঠেরা মনে করে গুজ্জররা যেহেতু দুধ বেচে, তাই তারা তাদের পরিবারকেও বেচে দিতে পারে অনায়াসে। অন্যদিকে গুজ্জরদের ধারণা জাঠেরা তাদের হৃদয় বৃটিশদের কাছে বন্ধক রেখেছেন। তাই তাঁরা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এহেন বিভাজন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মাঝে সবচেয়ে হতাশাজনক যে প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায় তা হলো আজও আমরা কেন নিজেদের সর্বাগ্রে একজন ভারতীয় হিসেবে ভাবতে পারলাম না।

এর দায় স্বাধীনতার পর সিংহভাগ সময় ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার যে প্রয়াস তারা জারি রেখেছিল তার ফলেই জোট-রাজনীতির উত্থান হয়। জোট রাজনীতি ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা শুভ-অশুভ তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু শরিকের বহুস্বর যে অনেক সময়ই দেশের স্বার্থের বিপ্রতীপে কাজ করেছে তা আমরা দেখেছি। আঞ্চলিক দলগুলির উত্থানের পেছনে যে জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতির যথেষ্ট প্ররোচনা রয়েছে তা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। জরুরি অবস্থার পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সালে জনতাদল সরকার মোরারজি দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে মণ্ডল কমিশন গড়ে, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া জাতিগত শ্রেণী-চিহ্নিতকরণের জন্য। আসন সংরক্ষণ ও কোটার ব্যাপারটাও এদের বিচার-বিবেচনার আওতায় ছিল। ১৯৮০ সালে দেওয়া কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সরকারি চাকরি ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণের শতাংশ ২৭ থেকে বাড়িয়ে ৪৯.৫ করে। এরপর একদশক কেটে যায়। ১৯৮৯ সালে ভিপি সিংয়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রিপোর্ট কার্যকর করতে গিয়ে বিপত্তি বাধে। প্রতিবাদে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজীব গোস্বামী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এর রেশ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও। আর ভারতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল অবিশ্বাস এবং সন্দেহের বিষবাষ্প।

ভোটব্যাঙ্কের তাগিদে কেবল মুসলমান তোষণেই ক্ষান্ত হলেন না আমাদের দেশের রাজনীতিকরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে তার জন্য জাত-পাত-ভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতি করে তাদেরকে বহুধাবিভক্ত করে দেওয়া হলো। সামাজিক এই ভেদরেখা মুছিয়ে দিতে দোলের কোনো বিকল্প নেই। পুজো-আচ্চা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, পালপার্বণ অনেক হলো, রবীন্দ্রনাথের মহাবাণী স্মরণ করে বলি— 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে।' একটা সামাজিক অনুষ্ঠান অন্তত যেন দেশের কাজে লাগে। সেই অনুষ্ঠান দোল বা হোলি হয়ে উঠুক সামাজিক মিলন ক্ষেত্রে। তবেই দেশের মঙ্গল, নচেৎ যথা পূর্বং তথা পরং।

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত গবেষণামূলক অনবদ্য গ্রন্থরাজি—

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা	-	১৫০.০০	ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত	-	৩.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১ম ও ২য় খণ্ড), প্রতিখণ্ড	-	১০০.০০	অন্তিম গতি : আল্লার পতিতালয়	-	১০.০০
মিথ্যার আবরণে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি	-	৭০.০০	ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা	-	১৫.০০
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম	-	১২.০০	इसलाम के तीन सिद्धान्त	-	১৫.০০
ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা	-	১০.০০	Three Decrees of Islam	-	২০.০০
পুরুষার্থ প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা	-	৩৫.০০	Falsehood shrouds the True History of		
এক নজরে ইসলাম	-	৪০.০০	Delhi and Agra	-	১৫০.০০
বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যত	-	৪.০০			

—: প্রাপ্তিস্থান :—

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

যোগাযোগ : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫, ৯৪৩৩০৩৩২৬৪

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

চিঠিপত্র

ওবামার ভারতবাসীকে অপমান

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারত সফরে এসে এবং নিজের দেশেও ভারতের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়ে বালখিল্য মন্তব্য করেছেন। একজন স্বাভামানী নাগরিক হিসেবে আমার মনে হয়েছে ওবামা ভারতবাসীকে অপমান করলেন। খবরে প্রকাশ, আমেরিকার শিক্ষিত লোকেরাও তাঁদের রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে বেশ বিরক্ত। তাঁরা মনে করছেন ভারতের বিষয়ে এরূপ বয়ান দেওয়া নিরর্থক শুধু নয়, অজ্ঞানতার পরিচায়ক। পুলিৎজার পুরস্কারে সম্মানিত ও ওয়াশিংটন পোস্টের স্তম্ভলেখক চার্লস ক্রথমর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বিষয়ে ভারতকে সিরিয়া ও ইরাকের সঙ্গে একাসনে বসানোর জন্য ওবামার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এক বেতারভাষণে ক্রথমর বলেছেন, 'এমন কী ঘটনা ঘটেছে যে ওবামা ভারতের সমালোচনা করলেন? এই প্রথম আমি ভারতের বিষয়ে এরকম শুনলাম। একথা পরিষ্কার যে ওবামা ভারতকে অপমান করলেন। এর কারণ হলো, ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ।' উল্লেখ্য, আমেরিকায় একটি সভায় ওবামা বলেছিলেন, ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। গান্ধীজী যদি বেঁচে থাকতেন তবে তিনি দুঃখ পেতেন।

আর একটি সাক্ষাৎকারে ক্রথমর বলেছেন, 'পৃথিবীতে অমুসলমান দেশের মধ্যে ভারতই দ্বিতীয় মুসলমান সংখ্যাধিক্য দেশ। এই তথ্য জানা সত্ত্বেও ওবামার ভারতের বিষয়ে এরকম মন্তব্য করা ঠিক হয়নি।' ক্রথমরের বক্তব্য, 'ভারতের লোকেরা কোনো খারাপ কাজ করেনি। তারা সমস্ত ভাষা, ধর্ম ও বিশ্বাসকে আশ্রয় দিয়েছে ও সম্মান জানায়। আর ভারত পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক বন্ধু। ওবামার মনে রাখা উচিত, সম্প্রতি জর্ডনে আই এস জঙ্গিরা একজন পাইলটকে যেভাবে পুড়িয়ে মেরেছে ভারতের হিন্দুরা এরকম কল্পনাও করতে পারে না।'

আমার মনে হয়, হিন্দু সংস্কৃতির বিষয়ে ওবামার জ্ঞান একেবারেই কম। এরকম মন্তব্য করে তিনি ভারতদেশটাকেই অপমান করেছেন। ভারতের থেকে সহিষ্ণুতা আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের বেশি নেই। তাই প্রশ্ন জাগছে, তিনি কি চার্চকে খুশি করার জন্য এমন কথা বলেছেন?

—**সৌরভ নন্দী,**
সিউড়ী, বীরভূম।

আম আদমি পার্টি ও মুসলমান ভোট

স্রেফ বিজেপি-কে ঠেকাতেই মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে আম আদমি পার্টিকে ভোট দিয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা স্বস্তিকায় গূঢ়পুরুষের কলমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই পত্র। বিজেপি-কে ঠেকাতে মুসলমানদের আর দোষ দি কেমন করে? দোষ হিন্দুদের নিজের। দিল্লী বিধানসভা ভোটে অভাবনীয় জয় আম আদমি পার্টি বা টিএমসি-র জয় নয়। এই জয় মুসলমান দুনিয়ার। তা না হলে পাকিস্তানের আই এস আই এত উল্লসিত কেন? সংবিধান ছুঁয়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবাসীর মঙ্গল করার শপথ নেওয়ার পরও খাগড়াগর-কাণ্ড চেপে দেওয়ার চেষ্টা করা দল এত উল্লসিত কেন? —তা অনুভব করা দরকার।

১০০ শতাংশ মুসলমানদের অন্তরে সুখ অনুভূত হয় ও মনে সমর্থন জাগে যদি মুসলমান-বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রসারণ ঘটানোর সম্ভাবনার সংবাদ পায়। ভারতে বিজেপি-র পরাজয় মানে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ ক্রমশ সুগম হওয়া। এতে মুসলমানদের সুখানুভূতি উপভোগ করা স্বাভাবিক, কারণ তাদের ধর্ম এই মৌলিক শিক্ষা দেয় অনবরত। কিন্তু ৮০ শতাংশ হিন্দু তার নিজের দেশে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখে ও বুঝেও কী করে তা মেনে নেয়? হিন্দুরা দেশের উন্নতির জন্য পরিবার পরিকল্পনা পালন করছে, বহু বিবাহ-বিরুদ্ধ আইন মেনে নিয়ে দেশের জনবিস্ফোরণ আটকে দিচ্ছে। কিন্তু মুসলমানরা তা মানছে না ধর্মীয় বিধির দোহাই দিয়ে। আসলে জনবৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশ দখল করে হিন্দুদের বিনাশ করাই এদের উদ্দেশ্য। এই নির্মম সত্যটি উপলব্ধি করে হিন্দুদেরও উচিত দলবদ্ধভাবে হিন্দুশক্তির পক্ষে ভোট দেওয়া।

মুর্শিদাবাদের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে দেশীয় ও অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ফতোয়ার দাপটে হিন্দুদের বাড়িতে শঙ্খ বাজানো বন্ধ হয়েছে, স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ হয়েছে। এসব জেনেও যদি কোনো হিন্দু বুঝতে না পারে ভবিষ্যতে কি দিন আসছে, যদি তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারে, তাহলে তাদের বিনাশের পথ প্রসস্ত হয়ে উঠবে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই। পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে হিন্দুদের বুঝে নিতে হবে যে চারিদিকে মুসলমানদের হয়ে কাজ করার অনেক দল সক্রিয় আছে যারা মুসলমানদের অন্যায়, জাতি-বিরোধী কার্যকলাপ ও চক্রান্ত ইচ্ছা করেই দেখতে পায় না। ভণ্ড সেকুলার দলগুলি আন্তর্জাতিক মুসলমান-চক্রান্তের সমর্থনে কাজ করে চলেছে স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই। মুসলমানদের হাতে নির্মম গণহত্যা চলেছে প্রায় ৯০০ বছর ধরে। এসব জেনেও যদি হিন্দুরা এককাট্টা না হতে পারে, তাহলে নিজের বা স্বজাতির বিনাশের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি? স্বজাতির প্রসারণ নাইবা হলো, স্বজাতির বিনাশ চায় এমন ব্যক্তি এই ধরাধামে আছে কি? যদি খুঁজে পান তাহলে হিন্দুজাতি আপন বিনাশের পথ চেয়ে থাকুক।

—**সুষেন বিশ্বাস,** বর্ধমান।

এবার মানুষ রুখে দাঁড়াক

শ্যামল কুমার হাতি

আমাদের এখন ভাবার সময় এসেছে, রাজনীতির জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য রাজনীতি? স্বাধীনতার পর থেকে দেখে আসছি, রাজনৈতিক দলগুলি যত কর্মসূচি তৈরি করে তাতে জনগণের লাভ হয়েছে সামান্য। দলগুলির লাভ হয়েছে প্রভূত। লাভ সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নয়— এটা মনে রাখতে হবে। লাভ হয় জনসমর্থন বৃদ্ধিতে। লাভ হয় বিরোধী দল থেকে সরকারে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষেত্রে। 'জনগণ' ভোটটা দিয়ে দেওয়ার পর যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। বলুন তো আর কতদিন এভাবে চলা যায়? সবাই তো জনগণের জন্য ভেবে আকুল, কই বিরোধী দল থেকে শাসকদল হলেও তো জনগণের কোনো উন্নতি হয়নি। আজও যারা চাষ করে তারা আধপেটা খেয়ে থাকে। অট্টালিকায় থাকে না। তাঁতি কাপড় বুনলেও তার পরনে জীর্ণ কাপড়। বড় বড় শিল্পের শ্রমিকের কথা বাদ দিয়ে যদি ছোট ছোট শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার খোঁজ নেওয়া যায় তা হলে চোখের জল ধরে রাখা মুশকিল হবে। এরাই তো জনগণ। এদের উন্নতি ছাড়া কি ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব? এদের নিয়ে কি ভারতবর্ষ নয়? এরা কি ভারতবর্ষের বাইরের লোক? বন্যা হলে, খরা হলে, দাঙ্গা হলে আগে এরাই মারা পড়ে। আগুন লাগলে এদের ঘরই আগে পোড়ে। এরপর শুরু হয় রাজনীতি। মারা যাওয়ার আগে কেউ খোঁজ না নিলেও মারা যাওয়ার পর 'আমাদের লোক' তকমা জুটে যেতে পারে। এই হলো রাজনীতি। যে মারা গেল সে কারও ছেলে, কারও বাবা, কারও স্বামী বা কারও ভাই হোক না কেন দুঃখটা সারাজীবন তারাই বইবে। বসন্তের কোকিলের মতো রাজনৈতিক দলগুলি শুধু কিছু সময় মিষ্টি মিষ্টি স্বরে কথা বলবে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কয়েকবছর আগেও সেই কাজ করতেন। কোথাও খুন, ধর্ষণ বা নারীনির্যাতন হলে সবার আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেতেন। এখন তাঁর অনেক কাজ। এখন তো শাসকদলের নেত্রী। এসব কাজ বিরোধীরাই করুক, তাইতো অধীর, সূর্যরা দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছেন। লক্ষ্যটা কি? শুধু সমবেদনা? না গদি।

অনেক হয়েছে। এবার এসব বন্ধ হোক। যদি প্রতিবাদ করতেই হয় তাহলে দলের পতাকা ছেড়ে এসে প্রতিবাদ হোক। শুরু হোক 'শুদ্ধ' প্রতিবাদ। যারাই ধর্ষণ করুক বা যারাই হত্যা করুক তারা সব সময় শাসক দলেরই লোক হয়। তারা শাস্তি পায় না। শাসকদলের লোক বলে পুলিশ তাদের ধরতে সাহস দেখায় না। তার থেকে পুলিশ থানার দরজা বন্ধ করে বা টেবিলের তলায় বসে আত্মরক্ষা করতে বেশি ভালবাসে। এখন পুলিশ শুধু কতগুলি লোকের ইউনিফর্ম পরা একটা দপ্তর মাত্র। তাদের কাজ হলো নেতা নেত্রীদের আসা যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে স্যালুট করা এবং তাদের খোসামোদ করা। ছিঃ! ভাবা যায় না। ওই দপ্তরে যাঁরা ব্যতিক্রম তাঁদের পদ হারিয়ে স্থান হয় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন দপ্তরে। কবি লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?' এখন উত্তর হবে, 'পুলিশ'। সবাই ওদের জুতো, চাঁটা মারলেও ওদের লজ্জা নেই। থুড়ি, ভুল হয়ে গেছে, 'সবাই' নয়। ওটা হবে 'শাসকদল'। অন্য কেউ মারলে পুলিশ তাদের ছেড়ে কথা কইবে না। তখন কত শক্তি তাদের। সেই জন্যই তো হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, আসানসোল ডিভিসনের জীবনবীমায় অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণের পরীক্ষা এবার সেনাবাহিনী নিয়ে করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উপর কলকাতা হাইকোর্টের আর ভরসা নেই। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান অনুসারে কোনো রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। যদি রাজ্য পুলিশের উপর মানুষের ভরসা না থাকে তা হলে আইন-শৃঙ্খলা কোথায়?

সৌরভ বা অরূপ হোক এদের হত্যাকারী শাসকদল-আশ্রিত গুণ্ডরা। পুলিশ এদের ধরতে পারবে না। শাস্তি এদের হবে না। তবে নিহতদের পরিবারের চাকরি হবে। এখন তো দেখছি খুন করার সময় খুনিরা বলবে, ''তোকে মারছি, তোর তো ভাইয়ের চাকরি হবে। সরকার তার সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দিতে পারে না, তারা তাদের অক্ষমতাটা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। চাকুরি প্রার্থীরা আমরণ অনশন করছে। কোনো নতুন চাকুরির আশা বাংলায় নেই। তার মাঝে জঘন্য হত্যার পর দোষীদের না ধরে চাকরির টোপ দেওয়া হচ্ছে। কোন পথে এরা সমাজকে নিয়ে যেতে চাইছে?

যারা সমাজের অন্ধকারের জীব, যারা খুনি, যারা ভদ্রলোকদের ভয় দেখায়, যারা রাতের অন্ধকারে ঘরে না থেকে কোনো পোড়ো বাড়িতে বা নির্মীয়মাণ বাড়িতে থেকে মদ্যপান করে। এই সব সমাজের কীটরা নির্বাচনের সময় দলের সম্পদে পরিণত হয়। দলীয় ঝাণ্ডা লাগানো গাড়িতে এরা থাকে। ভোট চুরি করার জন্য। এসব আমাদের চেনা দৃশ্য। তবু এই 'আমরা'-রাই চুপ। আমাদের সংখ্যা কি কম? মোটেই না। আমরা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে কেন চুপ থাকব? যারা সমাজের কীট তারা হাওয়া বোঝে। চোখের সামনে যে দলকে মানুষ সমর্থন করে বাঁচতে চায় এইসব 'কীট'গুলোই কালক্রমে ওই পপুলার দলে ঠিক সময়েই আশ্রয় নেয়।

এই সময় যদি 'আমরা'-রাই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করি তাহলে তো আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকব। দলে মদন-মুকুলের বদলে অন্য মদন মুকুল জন্ম নেবে। সিঁদুরে মেঘ দেখলে গোরু গোয়ালে ঢুকে পড়ে। আবার 'আমরা' গোয়ালে ঢুকে যাব। এস ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধের সেই বিখ্যাত উক্তিটি আবার ধ্বনিত হবে— 'সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে।' ■

সর্বভারতীয় সংগীত, নৃত্য ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব

দেবব্রত ঘোষ

শ্রীচৈতন্যদেবের একটা বিশিষ্ট অবদান হলো যে তিনি যখন যে প্রদেশেই গিয়েছেন সেই প্রদেশে তাঁর অনুগামীদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষ করে ভাগবতের অনুবাদ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। যার ফলে সেকালের নিরক্ষর মানুষেরা ভক্তির তাগিদেই মাতৃভাষায় অনুদিত ধর্মগ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেয়ে নিজেদের নিরক্ষরতা দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এখানেই বোধহয় তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের পথিকৃৎ।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের কয়েকশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং অসবর্ণ বিবাহে অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহকেও সমর্থন করেছেন যার প্রমাণ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইঝি নারায়ণী দাস মাত্র ৪ বছর বয়সে বাল্যবিধবা হয়, যার পুনর্বিবাহ হয়েছিল এবং সেই বিবাহের সন্তান চৈতন্যভাগবতের লেখক বৃন্দাবন দাস। বাংলাদেশে নবজাগরণের দুটো বড় ঢেউ এসেছিল— একটা মধ্যযুগে যাঁর নায়ক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব এবং আরেকটা ঢেউ এসেছিল ঊনবিংশ শতকে পরাধীন দেশে যার সূচনা রামমোহন- বিদ্যাসাগরের হাতে হলেও চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলস্বরূপ বাঙালি স্বকীয় জীবনদর্শন এবং কাব্য, সাহিত্য, শিল্পভাবনা ও সংগীত-সহ জাতীয় চেতনার বিকাশে কয়েক হাজার যোজন এগিয়ে গিয়েছিল। সমকালীন তত্ত্ব শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হলেও পূজ্য নয়, ব্রাহ্মণ অনাচারপরায়ণ হলেও তাকে পুজো করতে হবে— এর প্রত্যুত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিঃভক্তিপরায়ণঃ'— অর্থাৎ মানুষের জাত বা ধর্ম নয়, তার গুণ ও কর্মই বড়। একদিকে বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রের বিকৃত রূপ, অদ্বৈতবাদের মরীচিকা এবং অন্য দিকে হোসেনশাহি ঔদার্য্যের পথে ইসলামি আগ্রাসনের জয়যাত্রা— এই ত্রয়ীর বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তিনি আমাদের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রাভিযানের মহানায়ক।

বাংলা নৃত্যশিল্পের আদি গুরু শ্রীচৈতন্যদেব। রাগসংগীতের ওপর মহাপ্রভুর যে অসাধারণ দখল ছিল তার নমুনা কারুণ্যসারদা রাগে রুক্মিণীহরণ পালায় তার গাওয়া গান। বসন্ত রাগের ওপর পদাবলী সংগীত গাইতে গাইতে তিনি নেচেছিলেন (ললিতলবঙ্গলতা গাওয়াইয়া নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা— চৈতন্যচরিতামৃত)। তৎকালীন ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব বাসুদেব সার্বভৌমকে বলেছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের মতো এরকম অপরূপ সুন্দর নাচ তিনি কখনো দেখেননি। মণিপুরী নৃত্যকলা ভারতীয় নৃত্যশিল্পে এক বিশিষ্ট জায়গা করে নিয়েছে। মনিপুরী নৃত্যকলার একটা বড় অংশ রাধাকৃষ্ণলীলা-ভিত্তিক এবং তা ধর্মীয় প্রেরণা ও জীবনবোধ এসেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম থেকে। নাম-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে রাসলীলার অনুভব মণিপুরী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরণ এনে দিয়েছিল।

মণিপুরী বৈষ্ণবদের কাছে নাম-সংকীর্তন মহাযজ্ঞ যা তাদের জীবনধারার সঙ্গে জড়িত। মণিপুরী বৈষ্ণবদের প্রিয় নারদ সংহিতার প্রবচন ''হে নারদ! আমি স্বর্গে নেই, যোগীদের হৃদয়েও নেই, একমাত্র প্রেমিক ভক্তের সংকীর্তনেই আমার বাস।'' ভক্তিবাদী এই সাংগীতিক ধারা ও পরম্পরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছ থেকেই মণিপুরী বৈষ্ণবরা পেয়েছিলেন এবং মণিপুরী সংকীর্তন ও নৃত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম। মণিপুরী নৃত্যশালা থেকে প্রকাশিত ও নৃত্যগুরু বিপিন সিংহ সম্পাদিত 'পঞ্চমসার সংহিতা ও সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ''শ্রীচৈতন্যদেবের অসম ও পূর্বভারত পরিক্রমার সময় কীর্তনের রাগ যেমন হাবেলীর বৈশিষ্ট্য পেয়েছিল, কানাড়া ঘরানার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিল, যার ফলস্বরূপ বঙ্গদেশীয় কীর্তন বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ মণিপুর ও কর্নাটক, কেরল ও গুজরাটে সংগৃহীত হতে থাকল।'' মণিপুরী নৃত্যগুরু বিপিন সিংহ লিখছেন, ''আমাদের ওপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের কথা কি বলব, আমাদের সব কিছু তো তাঁকে নিয়েই''।

ঐতিহাসিক চার্লস গোভার লিখেছেন, ''বৈষ্ণবসাধক ও গায়কেরা ত্রিপদী ছন্দে গান রচনা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীচৈতন্য প্রচারিত সহজ নামসাধন পদ্ধতিতে, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না।'' ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রীও লিখেছেন, ''১৫১০ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পর দ্রাবিড় সঙ্গীত ও কাব্য-সাহিত্য চর্চা আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল।''

শ্রীচৈতন্যদেব শুধু যে বাংলার কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও সংগীতকে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছেন তাই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষকেই প্রভাবিত করেছেন এমনকী দাক্ষিণাত্যকেও। কেরালায় শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক বৈষ্ণব সংগীত ও সাহিত্যের নব উত্থানের মূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল মালয়ালি সাহিত্যের নবজাগরণ। ধ্রুবপদযুক্ত গীতিকবিতার ধারা স্পষ্টতই

বাংলা পদাবলীর অনুসরণ এবং যেহেতু ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র দ্রাবিড় সাহিত্যেই এই ধারার সংযোজন তাই শ্রীচৈতন্য প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। প্রখ্যাত মালয়ালি ঐতিহাসিক পি কে পরমেশ্বরণ নায়ার লিখেছেন, ''কেরলে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের পর থেকেই মালয়ালি কাব্যসাহিত্য তার ধারা বদল করেছিল।''

মহীশূরের কূর্গ এলাকায় সাতানি সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যাধিক্যের বিচারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল গেজেট অনুসারে সাতানি সম্প্রদায়ের মানুষ মূলত বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ উপাসক ও শ্রীচৈতন্য অনুগামী এবং তাঁরা নিজেদেরকে শ্রীচৈতন্য উপাসক বলেই পরিচয় দেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থে প্রেমভক্তি স্তোত্র রচয়িতা হিসেবে আমরা রামানন্দ তীর্থস্বামীর নাম উল্লেখিত দেখি। দক্ষিণভারতীয় এক সাধককবির ৯৪টি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য বন্দনা রয়েছে। প্রবোধানন্দ ভট্ট সরস্বতী ১৮৩টি শ্লোকে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম' কাব্য রচনা করেছিলেন যেখানে তিনি লিখেছেন— ''গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ, দূরাদেব দহন কুতর্কশলভান কোটীন্দুংশীতলো''। যার অর্থ তিনি আমার ভয় লজ্জা সব হরণ করে নিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যকে দেখামাত্র দিব্যপ্রভাবে তার্কিকদের হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে যেত। বেদান্তসার গ্রন্থের প্রণেতা সদানন্দপুরীর ওপরেও মহাপ্রভুর ব্যাপক প্রভাব ছিল। দক্ষিণভারতে বৈরাগী, দাস পদবিধারী গায়কেরা তামিল, মালয়ালি, তেলুগু ও কানাড়ী ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন এবং ষটপদী ও ত্রিপদী ধ্রুপদী বা ধূয়াযুক্ত গীতিকবিতার আবির্ভাব দেখা গেল যা শ্রীচৈতন্য অনুসারী।

বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভাসদ ছিলেন ঢুনডিরাম তীর্থ নামে এক বৈষ্ণব কবি যিনি 'ইরুমময় বিলক্কম' নামে এক কাব্য রচনা করেছিলেন। ওই কাব্যে শৈব ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে এবং ভক্তিবাদের ভিত্তিতে বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের কথা বলা হয়েছে। এই ঢুনডিরাম তীর্থের সঙ্গে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী কোনো স্থানে মহাপ্রভুর দেখা ও আলোচনা হয়েছিল যার পর থেকে ঢুনডিরাম তীর্থের কাব্যরচনা ও সঙ্গীত সাধনায় ব্যাপক রূপান্তর ঘটে যায়।

মারাঠি নবজাগরণের কাল ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতক এবং এই সময়কালেই মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত কবি ও সন্তসাধকদের আবির্ভাব। মারাঠা সাহিত্যে ধর্মীয় গীতিকবিতাকে অভঙ্গ বলা হোত। প্রখ্যাত ভক্তসাধক তুকারামের রচিত অভঙ্গের ওপর শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল যা তুকারাম নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন। আরেক মারাঠা ধর্মগুরু ও মরমিয়া সাধক একনাথের ওপরেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ছিল। একনাথ ও তুকারাম পরবর্তী মারাঠা শিল্প-সাহিত্যকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছেন এবং মহারাষ্ট্রের জাতিভেদ বিহীন ভক্তিবাদে ওপর একনাথ ও তুকারাম দুজনেরই ব্যাপক প্রভাব ছিল। নাম সংকীর্তনের মহিমা যেভাবে এই দুই মরমিয়া সাধক প্রচার করেছেন তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বাংলা কীর্তনের সাদৃশ্যই একনাথ ও তুকারামের ওপর মহাপ্রভুর প্রভাবের উদাহরণ।

গুজরাটের কাব্যসাহিত্যে ও ধর্মজীবনেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ বিখ্যাত সাধক কবি নরসিং মেহেতা। নরসিং মেহেতার শৃঙ্গারমালা কাব্যগ্রন্থে ৭৪০টি পদের উল্লেখ আছে। একটি পদে কবি বলেছেন, *"বাঁসলড়ী বাঈ সারে বহালে, মন্দিরমাঁ ন রবেরায় রে, ব্যাকুল থীনে বহালানে, জোবা শুঁ করুঁ উপায় রে।"* পদটির বাংলা অর্থ হলো, ''আমার প্রিয়তম বাঁশী বাজিয়েছেন, এক মুহূর্তও আমি ঘরে থাকতে পারবো না, আমি ব্যাকুল একবার তাঁকে দেখব বলে।'' গুজরাটি সাহিত্যিক কানাইয়ালাল মুন্সী তাঁর Gujarart and its Literature বইতে দেখিয়েছেন নরসিং মেহেতার জীবন, সাধনা ও কাব্যসংগীতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব কতটা ব্যাপক ছিল। নর্মদাশঙ্কর পাণ্ডা গুজরাটি ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব' রচনা করছেন। ওই গ্রন্থে নর্মদাশঙ্কর পাণ্ডা স্পষ্ট প্রমাণ সহযোগে উল্লেখ করেছেন নরসিং মেহেতার কাব্যে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার যে পদগুলো রয়েছে তার সঙ্গে গৌড়ীয় পদাবলী ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবধারা ও দর্শনের ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, জয়জয়ন্তী, ইমনকল্যাণ ও পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে যেসব বিখ্যাত বাংলা পদাবলী আছে তার হুবহু গুজরাটি পদাবলী ও কীর্তন রয়েছে একই রাগ ও তালকে ভিত্তি করে।

হিন্দীভাষী বিখ্যাত বিহারি সাহিত্যিক যজ্ঞদত্ত শর্মা 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিতমানস' রচনা করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে গোরখপুর গীতা প্রেস থেকে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীও শ্রীশ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতাবলী প্রকাশ করেন। এই দুই আকর গ্রন্থে সমকালীন ও চৈতন্যপরবর্তী হিন্দী কাব্যসাহিত্যে মহাপ্রভুর জাতিভেদবিবর্জিত মরমিয়া প্রেমভক্তি সমন্বিত সহজ ধর্মের প্রভাবকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে লোকগীতি বা লোকসাহিত্য শুধু জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাই নয়, অসংখ্য মানুষকে কাব্য, সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় উদ্বুদ্ধও করেছিল। বাংলায় বৈষ্ণবভাবাপন্ন এক মুসলমান কবির পদমঞ্জুসা বইতে ৯৪৩টি গান রয়েছে যার মধ্যে ৭৮টি গান চৈতন্য বিষয়ক। এই সব লোকগীতি বাংলার গ্রাম ও শহরের আখরায়, গৃহস্থ বাড়িতে, পথে ঘাটে গীত হয়ে কয়েকশো বছর ধরে বাঙালি মানসকে আশৈশব প্রভাবিত করে এসেছে। একই সঙ্গে মৃৎশিল্প, দারুশিল্প ও চিত্রশিল্পকেও সমৃদ্ধ করেছে। লিথোর মাধ্যমে পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের জন্য কলকাতা আর্ট স্টুডিও প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাদের প্রকাশিত অসংখ্য লিথোর মধ্যে চৈতন্যদেবের নানা মনোজ্ঞ রূপারোপ উল্লেখযোগ্য। গৌরসন্ন্যাস নামাঙ্কিত লিথো বাংলার চিত্রশিল্পের মৌলিকতার এক অনবদ্য উদাহরণ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসুও চৈতন্যদেবের নানা ছবি এঁকেছেন। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বাংলার অসংখ্য মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা মূর্তির ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো। বাংলার এই টেরাকোটা শিল্প চৈতন্য প্রচারিত ভক্তিবাদের ফসল। ■

বেদান্তের সারতত্ত্ব

সৌমেন নিয়োগী

বেদ ত্রয়ী ও অবিনাশী অর্থাৎ বেদ-ই অধ্যাত্ম বিদ্যামন্দিরের শাশ্বত গোপুর। বেদ অপৌরষেয় এবং অব্যয়। কারণ উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টির যে গূঢ় রহস্য তা চিরকাল শাশ্বত সত্য। প্রাচীন আচার্য ঋষিগণ এই সকল অসীমের ন্যায় যে মৌলিক সত্যগুলিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাকেই আমরা আকর বেদ গ্রন্থ হিসেবে বলতে পারি। যেমন— Graviation এমনই একটি মৌলিক সত্য বা অব্যয় যাকে বেদতুল্য মনে করা যায়, যা সমগ্র সৃষ্টির আদিতে ও যেমনভাবে বর্তমান বিনাশ হয়ে গেলেও তা শাশ্বত সত্য। এখানে আধুনিক বিজ্ঞানে নিউটন তাকে কেবল আবিষ্কার করেছেন। তাহলে তুলনা অনুসারে বেদ গূঢ় জ্ঞান বা সত্য =Graviation এবং নিউটন = বেদাচার্য ঋষি।

বেদরূপ এই মহান বৃক্ষের মুখ্যত দুটি কাণ্ড। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের তিনভাগ— সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। সংহিতায় দেবতার উদ্দেশ্যে প্রশস্তি, ব্রাহ্মণে মন্ত্রাদির দ্বারা বাহ্যিক জীবনযাপন নিমিত্ত রেখে অরণ্যে জীবন নির্ধারণ অর্থাৎ আরণ্যক। বেদের জ্ঞানকাণ্ডই হলো উপনিষদ যা আত্মজিজ্ঞাসু বা মুমুক্ষুকে তাঁর সমীপে উপনীত করায়— 'উপ সমীপেনিষীদত্যনয়েত্যুপনিষদ্' অথবা, 'উপসমীপং নিষাদয়তি গময়াতীত্যুপনিষৎ বাচক নাম ইতি'। অর্থাৎ প্রণবই যাঁর গুহ্যবাচক বা নাম, সেই ঈশ্বরের সমীপে গমনের পথ দেখায় যে শাস্ত্র তাকেই বলে উপনিষদ। এই উপনিষদই বেদের অন্ত— বেদান্ত, মস্তিষ্ক বা শীর্ষভাগ।

অনন্ত অসীম শাশ্বত ব্রহ্মাণ্ড মূলত দু'টি জগতে বিভক্ত। এক মরজগৎ বা ত্রিভুবন, দুই চিন্ময় জগৎ। মরজগতের তিন ভাগ— (১) স্বর্গ— দেবতাদের অধিষ্ঠান, (২) মর্ত্য— মানুষের অধিষ্ঠান, (৩) পাতাল— অসুরের অধিষ্ঠান। মরজগৎ নিদারুণ দুঃখময়। এখানে জীব সর্বোপরি পরাধীন। কোনো এক অজ্ঞাত বিশেষ কারণ অনুসারে আমরা এই মরজগতে অধিষ্ঠিত। Ultimate aim of human life is to reach immortality by entering Chinmoy Jagat. চিন্ময় জগৎ হচ্ছে সেই জগৎ যা জীবন-মৃত্যুর চক্রের অতীত বা বহির্ভূত। অর্থাৎ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মার ন্যায়। বেদ হলো সেই বিদ্যা যা মনুষ্যকে সাগরসম মরজগৎকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। যেখানে দেহ তরীর ন্যায়, উপনিষদীয় জ্ঞানের দ্বারাই সেই দুরূহ মরজগৎ অতিক্রম করার একমাত্র কাণ্ডারি বা পথ দেখাতে সাহায্য করে। *ie* Veda guides to cross the ocean of death, how to cross is guided by the Upanishads.

বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদকে জানতে সাহায্য করে শ্রীমদ্ভগবত গীতা ও ব্রহ্মসূত্রম্।

শঙ্করাচার্য

মধ্বাচার্য

নিম্বার্কাচার্য

রামানুজাচার্য

বল্লভাচার্য

বেদান্তের তিনটি মুখ্য স্তম্ভ। প্রস্থানত্রয়ে বিভক্ত সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র (১) স্মৃতি প্রস্থান— শ্রীমদ্ভগবতগীতা। It is a non arguementative that is dialectic form of speech or lecture stated by Lord Krishna to Arjun. (২) শ্রুতি প্রস্থান— উপনিষদ, এখানে নির্দেশ জাতীয় কিছু নেই। (৩) ব্রহ্মসূত্র বা ন্যায় প্রস্থান বা শারীরিক মীমাংসা দর্শন— অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন।

প্রস্থানত্রয়ের পাঁচজন ভাষ্যকার—

(১) জগৎগুরু আদি শঙ্করাচার্য, মালাবার উপকূলে কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত কালাডি নামক স্থানে নামবুদরি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অদ্বৈত্যবাদ স্থাপন করেছিলেন। (মতান্তরে জন্মসূত্রে বাঙালি গৌরপাদ আসল অদ্বৈত্যবাদের শ্রষ্ঠা)। (২) রামানুজ— মাদ্রাজ নগরের কাছে শ্রী পেরামপুদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট অদ্বৈত্যবাদের প্রবর্তক। (৩) শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য— মাদ্রাজের নিকট তৈলঙ্গব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। 'বেদান্ত পরিজাত সৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। (৪) শ্রীমৎ বল্লভাচার্য— তিনি শুদ্ধাদ্বৈত্যবাদের প্রবর্তক। তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'অনুভাষ্য'। তিনি দক্ষিণ ভারতের তৈলঙ্গ দেশের খৃষ্টীয় ষোড়ষ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। (৫) শ্রীমধ্বাচার্য— খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালাবার উপকূলের দক্ষিণ কানাড়ার উদিপি থেকে ৬ কিলোমিটার দূরবর্তী বেলিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দ্বৈত্যমত স্থাপন করেন। ■

রাজকন্যা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

এক যে রাজা। রাজার সাত রানী। কিন্তু তা হলে কি হবে?

রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মানিক, ঘরে ঘরে মোতি মোহরের হাট, সান্ত্রী সিপাই সৈন্যে সামন্তে পুব দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম জুড়ে রাজার রাজত্ব।

কিন্তু রাজার না আছে রাজপুত্র, না রাজকন্যা।

রাজার মন অন্ধকার। সাত রানীর মুখ কালি। পাত্র মিত্র সান্ত্রী সামন্ত, জন প্রজার দিনে রাতে চোখ খালি।

রাজপুরীতে দীপ জ্বলতে জ্বলতে নেভে। রাজপুরীর শাঁখ বাজতে বাজতে থামে। পিঞ্জরে শুক শারী গাইতে গাইতে, চুপ।

মাস যায়। বছর যায়। যুগ যায়। কত যাগ যজ্ঞ, পূজা আর্চা, মন্ত্র তন্ত্র। সব বৃথায়।

কি করেন... রাজত্বের দক্ষিণে নীল সমুদ্র, পায়ের সোনার নূপুর, মাথার হীরের মুকুট, ফেলে দিয়ে নীল সমুদ্রের ঢেউয়ে নেয়ে, রানীরা ধর্ণা দিলেন।

নীল সমুদ্রের তপ্ত বালু। সাত দিন যেতে না যেতে রানীরা মর মর। উঠলেন না। না, উঠেন না। রোদে তাপে, রানীরা অঙ্গার হয়ে যান।

দেখে পাখা মেলে এক নীল পাখি বললে,

‘নীল আকাশে তারার বন,
গায়ে মাখা চন্দন,
চন্দনে চাঁদমুখ
রাজকন্যা অনুপম।’

তারায় ঝিকিমিকি রাত।

সাত রানী চন্দন মাখেন। এ বছর যায় ও বছর যায়। হাওয়ায় ঠি ঠি করে কাঁপেন।

কিচ্ছু না। চাঁদমুখ রাজকন্যা কোথায়, তারামুখ রাজকন্যাও না। সাতমহলের আঙিনা ভাসে সাত রানীর চন্দনগলা চোখের জলে।

যায় যায় যায় রাত।

এক রাত্রে, এক চন্দন পাখির ডাক।

রাজার কাছে খবর এল, ছোটরানী যে আঁতুড়ে!

রাজপুরী জুড়ে শাঁখ দামামা, দীপের সার মশালের কাতার, শূল তরোয়াল ঝন ঝন...সিপাই সান্ত্রী খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মন্দিরের ঘণ্টা বাজে। ফুরায় না।

ছয় রানী যে ছোটরানীর আঁতুড় ঘরে!

কী? কী?

ধাই দাসীরা সরে বসে। ছয় রানী মাথা হেঁট করেন।

না—‘ওঙা ওঙা,’ না— চাঁদমুখ তারামুখ, এক কাঠের পুতুল!

বাদ্য বাজনা থেমে যায়। লোকের মুখ নেমে যায়। ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে রাজা ফিরে যান।

রাজসভায় বসেন না, জ্যোতিষীর সভায় বসে রাজা বলেন, ‘এ কি?’

আঙুলে গণেন, কাটিতে গণেন, গণে পেতে জ্যোতিষীরা বললেন, —‘মহারাজ, নীল পাখির কথা মিথ্যে হয় না, যাই হোক রাজকন্যা, কালো কালুটি হোক, কাঠের হোক, এই রাজকন্যা একদিন না একদিন জীয়োবে। ছোট রানীমার মহল ঘিরে ফুলের মালা দিন।’

রাজা বসে থাকেন, কি করেন, রাজা তাই দেন।

কাঠের কন্যা, না জীয়োলেই কি, জীয়োলেই বা কি? পুতুল তো পুতুল। মানুষ তো আর হবে না!

মনের দুঃখে রাজার রাজত্বের বাদ্য বাজনা আর বাজল না। পুরীর পঞ্চদীপ আর জ্বলল না। সাত রানী— শুক শারী উড়িয়ে দিলেন।

তা, কোন্ যুগে কোন্ জন্মে যে কাঠের পুতুল আবার জীয়োবে! কেউ বা জানে!

কেবল, ছোটরানীর মহলে কাঠের রাজকন্যাকে ঘিরে রইল ফুলের মালা। আর, রাজা দেশে দেশে দূত পাঠালেন, যে রাজপুত্র জীয়োবে এই রাজকন্যা, রাজকন্যা আর রাজার রাজত্ব সে-ই পাবে।

দূত যায়। যায় তো যায়।

রাজত্ব শুনে রাজপুত্রেরা এগোয়, কাঠের রাজকন্যা শুনে কেউ-ই আসে না।

দূত হয়রান।

এক ময়ূরপঙ্খীতে বাঁশি বাজিয়ে ভাসে এক রাজপুত্র।

দূতের কথা শুনে সেই রাজপুত্র বাঁশি নামাল।

রাজপুত্রের ধন ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু না আছে তার রাজত্ব পুবে না উত্তরে।

রাজপুত্র বললে— ‘আচ্ছা।’

ভাণ্ডার ভেঙে রাজপুত্র ধনরত্ন বার করে, — ‘কোথায় আছে ওষুধ বিষুধ, কোথায় মন্ত্র তন্ত্র, মণি চাও হীরে চাও, দেব কাঠের রাজকন্যাকে জীয়িয়ে দাও।’

ময়ূরপঙ্খী ভরে ওষুধ নিয়ে, দশ দল যোগী জ্যোতিষী নিয়ে রাজপুত্র গেল।

ওষুধ মেখে এক হাতে কাঠের পুতুল দুই হাত উঁচু হলো, মন্ত্রের শব্দে পশু পাখি দেশ ছাড়ল, রাজা রানী জন-পরিজন কালা হয়ে গেল।

তা তো হলো। তিন বছর তেত্রিশ দিনে কাঠের পুতুল হাঁ-ও করলে না। না-ও করলে না।

‘ধ্যেৎ!’ বলে রাজপুত্র সব ফেলে টেলে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দিলে।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

আশেপাশে

পাবলোর ঠাকুমা আর বই

পাবলো বরাবরই দেখেছে ঠাকুমা রোজ কিছু-না-কিছু পড়ে। খুব মন দিয়ে পড়ার অভ্যেস। মনেও রাখতে পারে। সকলকে পড়তে উৎসাহ দেয়। বাড়িতে বই প্রচুর। ঠাকুমা এখন যত্ন করতে পারে না নিজে। কাউকে বলেকয়ে গুছোয়। বিভিন্ন বিষয়ের বই ঠিকমতো সাজানো। খুঁজে নিতে কোনো অনুবিধে হয় না। বইয়ের প্রতি পাবলোর ভালোবাসা ছোট থেকে। ঠাকুমাই শিখিয়েছে। পড়ার মধ্যে সে মজা খুঁজে পেয়েছে। ঠাকুমার বয়েস ৯০ ছুঁই ছুঁই। মন দিয়ে পড়ে এখনও। খুব খুশি হয় কেউ বই দিলে। আর সে বই যদি পছন্দের হয় তাহলে তো কথাই নেই। পাবলোর বাবা সুমন্ত পেশায় ডাক্তার। সে বলে, 'মায়ের নাম ঊষা। ঊষা থেকে সন্ধ্যা মায়ের প্রিয় কাজ পড়া। এর মধ্যে বাড়ির সমস্ত কাজ দেখেছে। আমরা পড়ি। তবে মায়ের মতো নয়।' প্রতি বছর জন্মদিনে মাকে কিছু বই কিনে দেয় সুমন্ত। অন্য কোনো কিছু তাঁকে খুশি করে না যেমন করে বই। ঠাকুমার জন্মদিনে পাবলোও বই দেয়। নাতির কাছে পাওয়া বইও অনেক জমে গেছে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' কে লিখেছিলেন? কার সম্বন্ধে?

২. পশ্চিমবঙ্গের কোন্ মুখ্যমন্ত্রীর নামে কলকাতায় একটা রেলওয়ে স্টেশন আছে। আগে কি নাম ছিল?

৩. আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস কবে।

৪. 'দৃষ্টিপ্রদীপ' কার লেখা? 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর লেখক?

৫. 'কান্তকবি' কোন্ কবিকে বলা হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যু কবে?

উত্তর : ১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্তরঞ্জন দাশ সম্বন্ধে। ২. বিধানচন্দ্র রায় (বিধাননগর)। উল্টোডাঙা। ৩. ২১ ফেব্রুয়ারি। ৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৫. রজনীকান্ত সেন। ২৬ জুলাই ১৮৬৫-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০।

ফিরে পড়া

ভারত-লক্ষ্মী

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৪৪-১৮৯৮)

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনী,
হও বীরজায়া, বীর-প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণগাথা, বিক্রম-কাহিনি,
স্তনদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'

প্রগতিশীলতার নামে অশালীনতা

শবরী ঘোষ

আমরা যখন কোনো মানুষের সামনে নিজেকে প্রগতিশীল বলে দাবি করি তখন নিশ্চয়ই অপরদিকের মানুষটি আশা করেন যে, আমাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক অগ্রগতি ঘটেছে। কুসংস্কার, অজ্ঞতা আর সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজচেতনার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। আজ শিক্ষা, প্রশাসন এমনকী মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে নেই। কিন্তু প্রগতিশীলতার নাম করে এর পাশাপাশি কিছু মেয়ের আচরণ আমাদের ব্যথিত করে।

অনেক মেয়ে দাবি করে 'আমরা পুরুষদের সমকক্ষ হতে চাই' এবং সেই জন্য তারা ধূমপান ও মদ্যপান করে। পুরুষদের সমকক্ষ 'হতে চাওয়ার' ধারণাটাই ভুল। বৈদিককালে গার্গী, অপালা, ঘোষা প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনীরা পুরুষদের মতোই সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা অনেকে বেদের মন্ত্র রচনা করেছেন। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি মেয়েরা অস্ত্রশিক্ষা ও রথচালনায় দক্ষ ছিলেন। রামায়ণে দেখা যায়, দেবাসুরের সংগ্রামে দশরথের সারথি ছিলেন রানী কৈকেয়ী। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে প্রশাসন পরিচালনা করেছেন রানী দুর্গাবতী এবং আরো পরবর্তীকালে অহল্যাবাঈ হোলকর। বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ। তাঁরা কি পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন না?

সিগারেট কি প্রগতিশীলতার প্রতীক? ৩০ মে '১৪ তারিখে 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ভারতে এখন ১২.২ মিলিয়ন মহিলা ধূমপান করেন। গত ২৫ বছরে দেশে ধূমপায়ী মহিলার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.২ শতাংশ। একথা সকলেই জানেন, ধূমপানে ফুসফুস ও হার্টের সমস্যা, চোখে ছানি পড়া ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয় বন্ধ্যাত্ব। উল্লেখ্য, গত ২৫ বছরে ভারতে ধূমপায়ী পুরুষের সংখ্যা কিন্তু হ্রাস পেয়েছে। যাদের 'সমকক্ষ হওয়ার' জন্য ধূমপান করা তাদের মধ্যে যেমন দেরিতে হলেও বোধোদয় হচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে দেশের পক্ষে খুবই ভাল।

সংবাদপত্রে ডিস্কোথেক বা নাইটক্লাবে মধ্যরাতে মদ্যপ তরুণীদের হুল্লোড়ের ছবিও আমরা পত্রিকায় দেখেছি। 'কেষ্ট করলে লীলা। আমরা করলে বিলা/ কলিযুগের কেষ্টরাধা ডিস্কোথেকে করে ডান্স'— অশালীন পোশাক পরে মত্ত অবস্থায় নেচে রাধাকৃষ্ণর অপার্থিব প্রেমকে কোন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হচ্ছে? গত বছর মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করে সুইমিংপুলের জলে ডুবে এক তরুণীর মৃত্যু আমাদের স্তম্ভিত ও ব্যথিত করেছিল। অতিরিক্ত মদ্যপান ক্যান্সারের কারণ— এই কথাটি মনে রাখলে আখেরে মেয়েদের কল্যাণ হবে।

ডিস্কোথেক বা নাইটক্লাবের কথা বাদ দিই। মেট্রো, অফিস এমনকী কলেজে কিছু মেয়েকে এমন পোশাকে দেখা যায় যাতে নিজেরই লজ্জা করে। এক মহিলা ফ্যাশন ডিজাইনার সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, তিনি প্রকাশ্য রাস্তায় 'বিকিনি' পরেও ঘোরাঘুরি করতে পারেন। পুলিশ আছে কী করতে? খোলামেলা পোশাক পরা মহিলারাই যে পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছেন তা তো নয়। ৩ থেকে ৮ বৎসরের বালিকা, ষাটোর্ধ্ব মহিলা এমনকী বোরখাপরা মেয়েরাও হচ্ছেন। ঠিক কথা। যখন বোঝাই যাচ্ছে উক্ত মেয়েদেরই যখন বিকৃতকাম পুরুষদের হাত থেকে রেহাই নেই, তখন খোলামেলা পোশাক পরে তাদের জঘন্য প্রবৃত্তিকে আরো জাগিয়ে তোলার কোনো কারণ আছে কি? আর, আপনি 'বিকিনি' পরে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরবেন; তাই পুলিশকে সব কাজ ছেড়ে আপনার নিরাপত্তার জন্য 'বডিগার্ড'-এর ভূমিকায় নামতে হবে এই ভাবনাটাই হাস্যকর নয় কি? 'নাইটক্লাব'-এর ধারণা এসেছে মূলত পাশ্চাত্য থেকে। আমি পাশ্চাত্যের বিরোধী নই। কিন্তু নিজের দেশের উন্নত ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে ভুলে কারোর অন্ধ অনুকরণ করাটা মোটেই প্রগতিশীলতা নয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন তদানীন্তন সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল মহিলা। পল্লীগ্রামে বসবাস করে, পুঁথিগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েও তিনি বিদেশিনী নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনকে 'আমার মেয়ে' বলে ডাকতে পেরেছেন, মুসলমান ডাকাত আমজাদকে খাবার পরিবেশন করতে পেরেছেন, এমনকী থিয়েটারে গিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রশংসা করতে পেরেছেন। আমার কাছে আধুনিক মহিলা সুরেখা যাদব। রেলইঞ্জিনের সামনে সালোয়ার-কামিজ পরা সুরেখার ছবি তথাকথিত পুরুষদের পেশায় মেয়েদের এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। প্রগতিশীল মহিলা হলেন দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতা উইলিয়মস, কল্পনা চাওলা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসংখ্য মহিলা সদস্যরা। সিগারেট, 'হোক চুম্বন' বা পোশাক বিপ্লব ছেড়ে মেয়েরা যদি নারীজাতির সামগ্রিক বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তনে এগিয়ে আসেন তবেই বলা যাবে আমরা প্রগতিশীল হয়েছি। ■

জাতির ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপহাস

অতিথি কলম

জে এস রাজপুত

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সারা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে কারণ সেখানে ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক পরম্পরা তুলে ধরা হয়েছে যার প্রত্যেকটি ভারতবাসীর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নির্ণায়ক। কিন্তু এই প্রস্তাবনাকে সংশোধন করা হলো জরুরি অবস্থার কালে। সম্প্রতি এর মূল প্রতিচ্ছবি নতুন করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচার করছে যার মাধ্যমে রাজনীতির অঙ্গনে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা বিপাকে পড়েছে। ২০১৪-র মে পরবর্তী সময়ে কতগুলি ইস্যু খুঁজে বেড়াচ্ছে যার মাধ্যমে এরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া থেকে বাঁচতে চায়।

সরকারি পক্ষের স্পষ্ট আশ্বাস রয়েছে যে, আগামীদিনে প্রস্তাবনার এক সংশোধিত রূপ দেওয়া হবে যেখানে 'সোসালিস্ট' এবং 'সেকুলার' কথা দু'টি থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা নির্ভর করতে পারছে না। এরা এর মধ্যে চক্রান্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং ভীত এই ভেবে যে, পাছে সংবিধান থেকে 'সেকুলার' কথাটি বাদ চলে যায়। হয়ত অনেকেই এই ভেবে অবাক হবেন যে, 'সেকুলারইজম' বা ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব ভারতে কেবল ১৯৭৬ সালেই আমদানি করা হয়েছে।

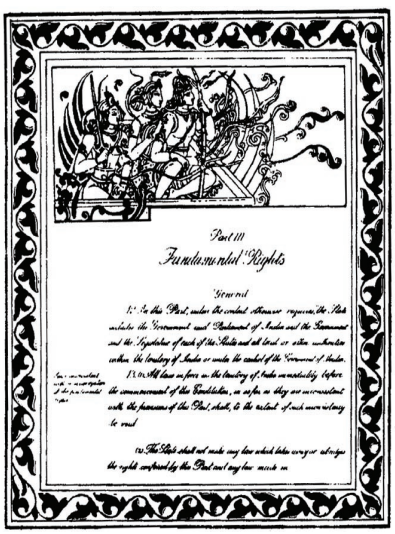

Part III

Fundamental Rights

General

12. In this Part, unless the context otherwise requires, the State includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.

13. (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in

প্রস্তাবনা থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি বাদ দেবার কোনো দাবিই কোনো মহল থেকে ওঠেনি, তবুও এই বিষয়টাকে হাতিয়ার করতে চাইছে স্বঘোষিত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষরা এবং এরা চাইছে তাদের লুকোন সাম্প্রদায়িক আজেন্ডা আস্তিন থেকে বের করে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলতে। সংবিধান-প্রণেতারা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানতেন, বুঝতেন।

এঁরা পরখ করেছেন বিদেশি শাসনে দেশ কীভাবে ভুগেছে এবং কীভাবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে স্বাধীনতা এসেছে। এঁদের অধিকাংশই স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি লিপ্ত ছিলেন, এঁরা সয়েছেন বৃটিশদের অত্যাচার এবং দীর্ঘকাল জেলে কাটিয়েছেন। এঁরা সকলেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ক্ষমতার লোভ ছিল না। এঁরা ভোলেননি তাঁদের যাঁরা মাতৃভূমির জন্য ফাঁসিকাঠে আত্মাহুতি দিয়েছেন। তাঁরা ভোলেননি জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড, ভারতীয় জাতীয় সেনাদের ২৬ হাজার শহীদের বলিদান। গণপরিষদের সদস্যরা দেখেছেন দেশবিভাগের ভয়াবহতা এবং মানুষের ব্যাপক নির্যাতন। সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠীর জঘন্য দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষময় ফল হলো ভারত ভাগ। সংবিধান রচনার দায় বর্তালো দেশের উৎকৃষ্ট মেধাসম্পন্ন মানুষদের কাঁধে।

নতুন ভারত গঠনে এর বৈচিত্র্য ও শক্তি নিহিত রয়েছে জাতির গৌরবময় অতীতে এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। সংবিধান প্রণেতারা তাঁদের সেরা উৎকর্ষতা ঢেলে দিয়েছেন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে।

এঁরা কিন্তু সজাগ ভাবেই 'সেকুলার' কথাটা সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত করেননি। ভারতীয় মননে সর্বধর্মে সমভাব বা সমান মর্যাদার কথা বলা হচ্ছে যুগ-যুগান্ত ধরে। এজন্য প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত না করে বরং প্রাথমিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজ সততই ধর্মনিরপেক্ষ এবং কর্তব্যপরায়ণ সমাজ। এভাবেই যুগ-যুগান্ত ধরে ভারতীয় সমাজ বেঁচে রয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো, কমপক্ষে দু' হাজার বছর ধরে ভারত সম্মান জানিয়ে এসেছে সব ধর্মকেই। এই কারণেই খৃস্টান ও ইসলামকে এদেশ দু' বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছে, তাদের এদেশে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে, তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো জীবিকা চয়ন করেছে এবং নিজেদের পদ্ধতিতে নিজ নিজ পূজা-অর্চনা করেছে। এই ছন্দের ব্যাঘাত ঘটেছে যখন আক্রমণকারীরা এদেশ লুঠ করেছে, নির্বিচারে ধ্বংস চালিয়েছে, হত্যালীলা সংগঠিত করেছে এবং ধর্মান্তর করেছে।

বৃটিশ শাসকরা এদেশে ভেদনীতির প্রবর্তন করেছে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। বৃটিশ পরবর্তী এদেশীয় সরকার সেই ভেদ-নীতি অনুসরণ করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে নিজ নিজ ভোট ব্যাঙ্ক গঠনের লক্ষ্যে এবং সংখ্যালঘু কল্যাণের নামে।

বাস্তবকে চেপে দিয়ে দেশের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক দল যে অসংবিধানিক কাজকর্ম করেছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। এদের আদর্শগত অনুগামীরা এবং অনুগামী শিক্ষাবিদগণ সরকারি মদতে পুষ্ট হয়েছেন। এরা একত্রে ভারতকে বিভক্ত করছে সাম্প্রদায়িক নিরিখে এবং দুর্ভাগ্য যে, এরা

অন্যদের সাম্প্রদায়িক বলে গাল-মন্দ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বামপন্থী ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতরা যাঁরা ব্যাপকহারে বিকৃতি বা ক্ষতি করেছেন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এবং লুটেরা ও বৃটিশরা এদেশের যা ক্ষতি করেছে তা থেকে অনেক বেশি এই ক্ষতি। এঁরা স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী যুগের শাসককুলের সমর্থন পেয়ে এসেছেন। এঁরা আবার অন্য বামপন্থীদের সহযোগিতায় যে নীতি অবলম্বন করেছেন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাতে তাঁরা নির্লজ্জভাবে দেশকে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনই করেননি; বর্ণ, সম্প্রদায়গতভাবে ধর্মের ভিতরেও বিভাজন ঘটিয়েছেন। ধর্মীয় সহমর্মিতা এবং জাতপাতহীন ভারতীয় সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, কিন্তু তাঁর স্বঘোষিত উত্তরাধিকারীরা চোখের পর্দা উল্টে নির্লজ্জভাবে তাঁর নীতি ও মূল্যবোধকে ভূ-লুণ্ঠিত করেছেন। তাঁরা সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

এইসব প্রক্রিয়ায় তারা ভারতীয় মুসলমানদের উন্নয়নের মান বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। ইমামভাতা, হজ যাত্রীদের জন্য খররাতি এবং ধর্মভিত্তিক ছাত্রবৃত্তি-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদতে ক্ষতি করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বকে। শাহবানু মামলা আমরা এখনও ভুলিনি। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিল শাহবানুকে প্রতি মাসে আড়াইশো টাকা ভাতা দিক তাঁর বিচ্ছেদকারী স্বামী। তৎকালীন রাজীব সরকারের মন্ত্রী তারিফ মহম্মদ খান রাজীবেরই সম্মতিক্রমে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সমর্থনে ভাষণ দিলেন এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যদি সেই সময়ে লাগু হোত তবে ভারতের অসংখ্য মুসলমান মহিলা উপকৃত হতেন। কিন্তু এমনটা ঘটল না। উল্টে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের চাপে এবং ভোট ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের চাপ উপেক্ষা করতে না পেরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশকে মান্যতা দিলেন না। সংবিধান সংশোধন হলো আর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ধামাচাপা পড়ল। ভয়াবহ জরুরি অবস্থায় লোকসভা মেয়াদকাল বাড়ানো হলো এবং তুর্কম্যান গেটের গণহত্যার বিচারও হলো না। এইসব ঘটনাবলী কি সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে?

সকল ধর্মকে সমান সম্মান প্রদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অতীতে বিভিন্ন উপায়ে এই সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে রুখে দিয়েছে। ভারতীয়রা জানে কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে হয় এবং সেটাই হলো প্রতিটি ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় আশ্বাস।

(লেখক প্রাক্তন এন সি ই আর টি-র অধিকর্তা)

স্বস্তিকা

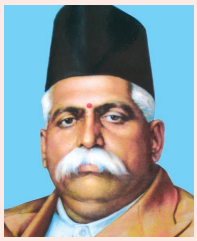

২৩ মার্চ, ২০১৫, বিশেষ সংখ্যা

ডা: হেডগেওয়ার ও বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন

সারা দেশ জুড়ে আজ জীবনের সব ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ভাবনাকে দেশব্যাপী সর্বস্পর্শী করার ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণে আসে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার— সংক্ষেপে ডাক্তারজী। এই বছর তাঁর ১২৫তম জন্মবর্ষ। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা-চিন্তার আজ কতটা প্রতিফলন ঘটেছে— এই বিষয় নিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে স্বস্তিকা-র আগামী২৩ মার্চের বিশেষ সংখ্যাটি।

সম্পূর্ণ রঙিন। মূল্য ১৫ টাকা। সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।

অসমে পুর নির্বাচন, রাজস্থানে পঞ্চায়েত নির্বাচন

ক্রমেই জন সমর্থন হারাচ্ছে কংগ্রেস

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ সদ্য সমাপ্ত দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনে আপের জয়ের পর দেশজুড়ে কংগ্রেস, বামশিবির, তৃণমূল-সহ বিভিন্ন বিজেপি-বিরোধী শক্তিগুলি গেল গেল রব তুলেছে। কিন্তু অসমে পুর নির্বাচনে ও রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচন বিজেপি-র দারুণ সাফল্য দিল্লীর ফলে অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে।

অসমের পুরসভার নির্বাচনে ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, অসমের শাসকল দল কংগ্রেস এবারের পুরসভা ও টাউন কমিটির নির্বাচনে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এই ফলাফলের রেশ যদি ২০১৬ সালে অসম বিধানসভা নির্বাচনে প্রসারিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কংগ্রেস ক্ষমতা হারাবে, উঠে আসবে বিজেপি। যদিও অসম পুরনির্বাচনের ফলাফলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ, অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অঞ্জন দত্ত তা মানতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস অসমের শহরাঞ্চলে যে ভোট পেয়েছিল তার তুলনায় সদ্য সমাপ্ত পুরনির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অঞ্জন দত্ত একধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, অসমের শহরগুলিতে বাঙালি হিন্দু ও হিন্দিভাষী মানুষের বসবাস বেশি। এই জনগোষ্ঠীগুলির কাছে নাকি কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার অসমের ৩২টি পুরসভা ও ৪২টি টাউন কমিটির মোট ৭৪টির মধ্যে ২০০৯ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস ৭১টি দখল করেছিল। কিন্তু চলতি নির্বাচনে ৭৪টির মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১৮টি। ওদিকে, ৩২টি পুরসভার মধ্যে বিজেপি ২১টি, কংগ্রেস ৮টি ও অসম গণপরিষদ ১টি দখল করেছে। অন্যদিকে, অসমের ৪২টি টাউন কমিটির নির্বাচনে বিজেপি ২৪টি, কংগ্রেস ১০টি ও অসম গণপরিষদ ১টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিজেপি ৪৫, কংগ্রেস ১৮ ও অগপ ২টি দখল করেছে।

তরুণ গগৈ-এর কপালে হাত।

অসমের ডিব্রুগড়, জোরহাট, নগাঁও, হোজাই, লামডিং, শিলচর, বদরপুর, ঢেকিয়াজুলি, তেজপুর, মার্ঘেরিটা, রানাপা পা, খারুপেটিয়া ইত্যাদি শহরগুলি বিজেপি দখল করেছে। অগপ নেতা ফণিভূষণ চৌধুরীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির দরুন অগপ বঙ্গাইগাঁও পুরসভা দখল করেছে। গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, লক্ষ্মীপুর, করিমগঞ্জ, মঙ্গলদৈ প্রভৃতি শহরগুলিতে কংগ্রেস পুরসভা গঠন করতে পেরেছে। অসমের অধিকাংশ শহরের হিন্দু বাঙালিরা বিজেপি-কে সমর্থন দেওয়ার ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে যেভাবে হিন্দু বাঙালিরা অসমে বিজেপি-কে সমর্থন করেছে তাতে কংগ্রেস প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কথা ভেবে।

এদিকে রাজস্থানে বিজেপি এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৩টি জেলা পরিষদ দখলে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে ৯টি জেলা পরিষদ আসন। একইভাবে রাজস্থানে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে বিজেপি ১৬৩টি পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান পদ দখলে সমর্থ হয়েছে। যেখানে কংগ্রেস পেয়েছে ১১৯টি সমিতির প্রধান পদ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন অসম, রাজস্থানের ফলাফল প্রমাণ করছে যে, এখনো সাধারণ মানুষের আস্থা রয়েছে বিজেপি-র প্রতি। দিল্লীর ফলাফল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। ■

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

মূল্যবোধ কি আজ সত্যিই বিপন্ন?

বরুণ দাস

মূল্যবোধের অভাব এবং অবক্ষয় সম্পর্কে আজকাল প্রায়ই একটা অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু এই বহুশ্রুত অভিযোগের মূল ভিত্তি কোথায়? মহাভারতের কালে কিংবা মুঘল যুগেও কি আজকের চেয়ে বেশি মূল্যবোধের মর্যাদা ছিল? কি বলেন আজকের ঐতিহাসিক-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক-কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক-নাট্যকার- অভিনেতা কিংবা বুদ্ধিজীবীরা? সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। বলাবাহুল্য, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

নিমাইসাধন বসু

উল্লেখ্য, নব্বুইয়ের দশকে অন্যধারার থিয়েটারে যখন ভাটার সময় চলছে, তখন সায়ক মঞ্চস্থ করে তাদের নতুন প্রযোজনা 'দায়বদ্ধ'। নাটকে দর্শক টানার তেমন কোনো চমক বা চটকদারী মালমশলা নেই। অথচ দর্শক কিন্তু তৃপ্তভরে নাটকটি দেখছেন। উপভোগ করছেন সেক্স-ভায়োলেন্স বহির্ভূত এক সাদামাটা নাটক যার কেন্দ্রমূলে রয়েছে মানবিক মূল্যবোধের বলিষ্ঠ উপাদান। প্রতিটি শো হাউসফুল। ঘাটতি নেই হলমুখী দর্শকের। এভাবে পাঁচশো রজনী অতিক্রান্ত। সেবার অন্যধারার থিয়েটারের মরাগাঙে বাস্তবিক অর্থেই বান এনেছিল সায়ক-এর দায়বদ্ধ।

তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে বিপর্যস্ত মূল্যবোধ কি আজ আশ্রয় নিয়েছে শুধু সাংস্কৃতিক অঙ্গনে? স্বীকার্য, শুধু চন্দন (সেন)-চর্চিত মেঘনাদ ভট্টাচার্য'র দায়বদ্ধ-ই নয়, ওইসময় কলকাতার অন্যধারার থিয়েটারে যেন মানবিক মূল্যবোধের ঢল নেমেছিল। ঠিক সাতষট্টির রাজনৈতিক মূল্যবোধের জোয়ারে যেমন সত্তর ও আশির দশকের অন্যধারার থিয়েটার ভেসে যাচ্ছিল।

তাহলে মূল্যবোধ কি আজ সত্যি বিপন্ন? কি বলছেন বিশিষ্টজনেরা? এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বিশ্বভারতী'র প্রাক্তন উপাচার্য ড. নিমাইসাধন বসু বলেছিলেন যে মূল্যবোধটা শাশ্বত অর্থাৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যার পরিবর্তন হয় না, তার যদি অবক্ষয় ঘটে, তাহলে আমি বলবো অবক্ষয় ঘটেছে। এরমধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন যুগের প্রয়োজনে ঘটে গেছে যাকে আমরা মেনে নিতে পারছি না— তাকে আমি অবক্ষয় বলবো না, বলবো জেনারেশন গ্যাপ। আমার দৃষ্টিতে তা ভাল না লাগতে পারে, কারণ আমি তাতে অভ্যস্ত নই বলে অবক্ষয় বলতে পারি না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. সন্তোষ ভট্টাচার্যের মতে, মূল্যবোধের অবক্ষয় কথাটা আপেক্ষিক। তাঁর কথায়, আমাদের দেশে বর্তমান সমাজে সব থেকে অগ্রসর অংশরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, সেই মূল্যবোধকে অনেকে পুরনো দৃষ্টিতে অবক্ষয় বলে মনে করতে পারেন। এইভাবে যুগে যুগে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সামাজিক মূল্যবোধও পাল্টায়। এবং সমাজ যেহেতু কখনই প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মূল্যবোধকে এক মানদণ্ডে বাঁধতে পারে না, সেই কারণে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণাটি খুব স্পষ্ট নয়।

সন্তোষ ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. পবিত্র সরকারের বক্তব্য, হ্যাঁ, আমি মনে করি, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব বা অবক্ষয় ঘটেছে। ড. সরকার বলেন, তৃতীয় বিশ্বের অভাব বা দারিদ্র্যের জন্য আমরা কতগুলো মূল্যবোধ অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হই। তাছাড়া আমাদের সামনে এমন কতগুলো দৃষ্টান্ত দেখি যা আমাদের মূল্যবোধগুলোকে রক্ষা করতে উৎসাহ দেয় না। মূল্যবোধগুলো ধ্বংস করার জন্য যে সমস্ত শক্তিগুলো কাজ করে, তাদের মধ্যে একটা হলো রাজনৈতিক অভ্যাস। একে অবশ্য রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির ফলে মূল্যবোধের ভিত বা শেকড় নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে মন্তব্য করেন ড. পবিত্র সরকার। তিনি আরও বলেন, এছাড়া আছে অর্থনৈতিক কারণ। রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে আলাদা করছি নেহাত আলোচনার জন্য। এখানে আমরা অর্থনীতিটাকে Micro level-এ আনতে পারি রাজনীতিটাকে যদি Micro level-এ ধরে নিই। আর একটা কথা বলতে পারি সাংস্কৃতিক কারণ যার মধ্যে আছে Printed Media ও Electronic Media.

মূল্যবোধের অবক্ষয় সর্বত্র বলে মনে করতেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অমলেন্দু দে। তাঁর কথায়, অনেক কর্মচারিরা উপরি অর্থ না নিয়ে কাজ করতে চান না অথবা সরকারি উন্নয়ন খাতে টাকা ঢাললেও যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে না কারণ কর্মচারিদের আলস্য ও অর্থ-লিপ্সা মানে অবক্ষয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্র বর্তমানে অবক্ষয়ের আবর্তে পাক খেয়ে চলেছে। ড. দে'র মতে,

এর কারণ দু'টি। প্রথমত, উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘদিন থাকার ফলে নতুন মানসিকতায় মানুষ অভ্যস্ত হতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, আর্থিক দূরবস্থা, বেকারী ও দারিদ্র্য।

যুগান্তর পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক তথা বিশিষ্ট বামপন্থী কবি কৃষ্ণ ধর অবশ্য মনে করেন না, আজকের এই মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন স্তরে গেছে তারজন্য তিনি হতাশ হতে পারেন। তিনি বলেন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথাটা সব সময়ে এগিয়েই চলে এবং যে সমস্ত বিশ্বাস নীতি মানুষ শ্রেয় বলে মেনেছে এবং যার জন্যে সে সংগ্রাম করেছে, প্রাণও দিয়েছে, যাকে বিকশিত করার জন্য সে সংস্কৃতি চর্চা করেছে, সাহিত্য সৃষ্টি করেছে—এ সমস্ত মিলেই তো একটা সমাজের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। আমাদের সমাজের মূল্যবোধ সম্পর্কে আমরা যখন বলব, তখন আমরা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই তার বিচার করব।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাংবাদিক অরুণ বাগচী জোর দিয়েই বলতেন, মূল্যবোধের অভাব তো নিশ্চয়ই ঘটেছে— এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশই নেই। তাঁর মতে, যাঁরা সমাজের মাথা তাঁরা যদি স্বার্থচিন্তার কাছে নিজেদের সঁপে দেন, তাহলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সমাজে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, হয়তো আমাদের মনের গঠনও কিছুটা দায়ী। ব্লটিং পেপার যেমন কালি শুষে নেয়, তেমনি করে আমরা এমন সব দোষকে গুণ ধরে নিয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছি যা শেষ পর্যন্ত আমাদের মূল্যবোধকে আবৃত করে দিচ্ছে। অবক্ষয়ের আর একটি কারণ, অরুণ বাগচী'র কথায়, আমরা যত ঘেঁষাঘেষি করে চলতে বসতে এবং বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, ততই যেন সকলে সকলের কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। নৈকট্যবোধ যেখানে নেই সেখানে আত্মীয়তা জন্মাবে কি করে?

প্রবীণ কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বিশদ আলোচনায় না গিয়ে বলেন, মূল্যবোধের অবক্ষয় তো ঘটেই থাকে। এর পেছনে অনেক আর্থ-সামাজিক কারণ আছে। এছাড়া আর একটা প্রধান একটা কারণ হলো আদর্শহীনতা। প্রায় একই সুরে কবি-সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত বলেন, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের অস্থিরতা, অনুসরণযোগ্য আদর্শের অভাব এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে বিষণ্ণতার বোধই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

একদা রসে-বসে খ্যাত এবং বর্তমানে আধ্যাত্মিক জগতে ডুব দেওয়া প্রবীণ সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, মূল্যবোধের শুধু অভাব নয়, মৃত্যু ঘটেছে। তিনি বলেন, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ শুধু নিজের ও তার পরিবারের কথাই ভাবছেন। আর এই আত্মকেন্দ্রিকতা নতুন মূল্যবোধ তৈরি করেছে। সেটা হলো, Crush and win. একজন মানুষ আর একজন মানুষকে প্রতিযোগী ভাবছে, সহযোগী নয়। ফলে ব্যক্তি বিশেষের Personal wealth বাড়লেও Social wealth বাড়ছে না। শান্তি ও সুখের বাতাবরণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ভোগী হচ্ছে, আধ্যাত্মিক হচ্ছে না। জ্ঞানের জগত হারিয়ে যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে ব্যবসায়িক জগত। একালের মন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে Eat, drink and merry.

যে ধরনের সামাজিক অবস্থা তৈরি হচ্ছে তাতে মূল্যবোধের অভাব দেখা দিচ্ছে বলে মনে করতেন বর্ষীয়ান বামপন্থী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলতেন, মূল্যবোধের অভাব অতীতেও যে একেবারে ছিল না এমন নয়, অতীতেও ছিল। সবদেশেই ছিল। আমাদের দেশেও ছিল। পদাতিক কবির কথায়, আগে কোনো মানুষ মারা গেলে বা খুন হলে— এই যে প্রাণ থাকা বা না-থাকাটা মানুষকে যেভাবে পীড়িত করত, আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ তা সয়ে নিয়েছে, আবার কখনও নিজেকে বাঁচাতে গিয়েও তা সইয়ে নিয়েছে। তাঁর কথায়, যদিও ভ্রূণহত্যা আজ আইনগত স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি, এটা অত্যন্ত অনৈতিক শুধু নয়, অমানবিকও বটে।

মনোজ মিত্র

স্বভাবতই জীবন ও জীবনবোধ সম্পর্কে মানুষের মমত্ব চলে গেলে মানবিক মূল্যবোধেরও অবক্ষয় হয়। এটা শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, গোটা পৃথিবীর সংস্যা। এর মধ্যে নানাবিধ সামাজিক কার্যকারণ সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, তবে এই অবক্ষয়ের জন্য ব্যক্তি মানুষেরও বড় একটা ভূমিকা আছে। এটা ঠিকই, মানুষ সামাজিক অবস্থার অধীন কিন্তু এটাও ঠিক যে, সমাজের একজন হিসেবে তাকেও চারপাশে তাকাতে হবে এবং নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী তার ব্যক্তিজীবনে মানবিক মূল্যবোধের ভিতকে বজায় রাখতে হবে। এটা অনেকাংশে শিক্ষাদীক্ষার ওপর নির্ভর করে বলে মনে করতেন পদাতিক-কবি। তাঁর কথায়, শিক্ষা বলতে প্রচলিত পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা নয়, জীবনের বাস্তবতা থেকে আহরণ করা শিক্ষা।

সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে বলে মনে করেন না বর্ষীয়ান নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মনোজ মিত্র। এবং সেটা তিনি বলতে পারছেন এই সমাজে মূল্যবোধ জাগ্রত আছে বলে। চিত্রপরিচালক তপন সিংহ-কৃত ছায়াছবির বাঞ্ছারাম তথা মনোজ মিত্র বলেন, মূল্যবোধ-শূন্য কোনো সামাজিক অবস্থা কল্পনা করা যায় না। সামাজিকতা, সামাজিক বন্ধন, সমাজের উৎপত্তি ঘটেছে সাক্ষর মূল্য-সচেতনতা থেকে। আবার আজকের সমাজে তার অভাব বা অবক্ষয় বা তার প্রতি আক্রমণ দেখে আমরা যেমন শঙ্কিত, শিহরিত বা আতঙ্কিত হই, সর্বকালে সব সমাজে এটাও ঘটেছে। এটা একালের

নতুন কিছু নয়।

সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় স্বীকার করে নিয়ে রঙ্গকর্মী'র নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেত্রী ঊষা গাঙ্গুলি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মূল্যবোধের দ্রুত ও ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা দুনিয়াতে এটা ঘটেছে। এটা নতুন সময়ের বা নতুন যুগের সঙ্কট। রঙদালি-খ্যাত ঊষার কথায়, এখন সবকিছুতেই যান্ত্রিকতা। মানুষ তার নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজন নিয়ে এত ব্যস্ত যে অন্য মানুষের দিকে তার তাকানোর ফুরসত নেই। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, প্রতিটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা। এই পরিবেশে অন্য মানুষের জন্য ভাবা বা কিছু করা অর্থাৎ সহানুভূতি বা সমবেদনা বা পরস্পরের মধ্যে একাত্মবোধ— এগুলো বজায় রাখা খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঊষার আক্ষেপ, অথচ আমাদের দেশে এতটা অবক্ষয় হওয়ার কারণ ছিল না। আসলে আমাদের দেশে প্রধানত গ্রাম-প্রধান। Urbanization হচ্ছে ঠিকই, তবে এখনও জনসংখ্যার অধিকাংশ গ্রামেই থাকে। কিন্তু গ্রামজীবনেও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে দ্রুত। ঊষার মনে হয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গোটা সমাজকে এবং রাজনৈতিক কাঠামোকে কলুষিত করেছে। পুঁজিবাদ consciously and systematically সমাজের মধ্যে একটা consumerism develop করিয়ে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। এটাও অবক্ষয়ের একটা বড় কারণ।

বিশিষ্ট চিত্রকর ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত মনে করেন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ পশ্চিমের consumer oriented society-র চমক আমাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়েছে। মানুষ মানুষে অর্থনৈতিক দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতারা দেশশাসনের অধিকার পাবার পর মানুষের সামনে কোনো আদর্শ দাঁড় করাতে পারেননি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার লোভে সমস্ত মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরাও ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাছে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ ও নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। তার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ ধ্বংস হয়েছে ও হচ্ছে।

গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব প্রয়াত সুধী প্রধান মনে করতেন, মূল্যবোধ অবক্ষয়ের মূল উৎস হলো অভাব। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এই অভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। মানুষের চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ অপ্রতুল। অথচ মানুষ যে কোনো মূল্যেই পেতে চাইছে— শুধু চাই আর চাই। ফলে স্বভাবতই মূল্যবোধের অবক্ষয় ব্যাপকতর হচ্ছে। অভিনেতা তরুণকুমারও মনে করতেন, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো অভাব। অভাব বাড়তে বাড়তে এমন এক জায়গায় যাচ্ছে যে, মানুষ আর কিছু ভাবতে চাইছে না। ফলে মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা— সেটাও আর ধরে রাখতে চাইছে না। যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন প্রয়াত অভিনেতা রবি ঘোষ। তিনি মনে করতেন, বিশ্বাসহীনতা থেকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের শুরু ও তার বাড়-বাড়ন্ত। যুগে যুগে এই বিশ্বাসহীনতা ছিল, ফলে অবক্ষয়ও ছিল। রবি ঘোষের মতে, আবার নতুন নতুন ধর্মের মোড়কে, কোন যুগে তা গৌতম বুদ্ধ বা আবার কোন যুগে তা শ্রীচৈতন্য— মানুষ নতুন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আবার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। তাঁর কথায়, ধরুন, আমাদের যৌবনে মার্কসবাদের প্রতি পশ্চিমবাংলার যুবকেরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেছিল, কিন্তু বর্তমানে মার্কসবাদের বিপর্যয়ের পর তারা বিশ্বাস রাখবে কোথায়? একটা বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে আর একটা নতুন জায়গা গড়ে উঠছে না। এই সন্ধিক্ষণে বিশ্বাসহীনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় এবং অবক্ষয়ও চূড়ান্ত সীমাতে পৌঁছবে।

মূল্যবোধের ব্যাপারটা আমরা সবাইকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারিনি অথবা আমরাও পাইনি হয়তো— বলেছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা বহুরূপী'র প্রবীণ নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেতা কুমার রায়। তাঁর কথায়, একটা সময়ে শেখানো হোত মূল্যবোধের ভিত্তিতেই। কুমার রায়ের আক্ষেপ, কিন্তু আজ আমরা ন্যায়-অন্যায় বোধের থেকে অনেক বেশি শিক্ষা পাচ্ছি কি করে আমরা আমাদের শিক্ষার জায়গায়, চাকরী-বাকরীর জায়গায়, প্রতিযোগিতামূলক এই জগতে কি করে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারব। আমাদের বড় হওয়ার র‍্যাট-রেসের জন্য প্রথম থেকেই অন্য এক মানসিকতা গড়ে তোলা হচ্ছে, তারমধ্যে কোন মূল্যবোধর শিক্ষা থাকছে না। আমাদের সচেতন প্রয়াসেই আজকের এই মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে।

আসলে সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা দায়বদ্ধতা আছে। তা আমরা অনেকেই স্বীকার করি না এবং পালন করা তো অনেক পরের কথা। আমরা বরং যে Permissive society তৈরি করে ফেলেছি, সেখানে একটাই কথা— কিসের মূল্যবোধে? রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার পঙক্তির মতো— 'বড়ো হওয়া চাই— নিতান্ত পক্ষে হতে হবে ভজু মল্লিকের জুড়ি'। আজ আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও সমাজগত যে শিক্ষা— সেখানে এই মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো শিক্ষাই হচ্ছে না। এমন কি, স্বাভাবিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাতেও মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার মতো কোনো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। এখন তো আসলে আধুনিক প্রযুক্তির যুগ। পরমাণু বোমার প্রয়োগ তো কোনো মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষায় নেই।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সর্বকনিষ্ঠ অ্যানিমেটর অমন রহমান

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বয়স মাত্র ৪ বছর। পড়াশোনার হাতেখড়ি হওয়ার সময়। পাশাপাশি হাসি কান্না, হাজারো দুষ্টুমি এবং খেলাধুলার মধ্যে শৈশবকে উপভোগ করার বয়স। কিন্তু কখনই আমরা ভাবতে পারব না এই বয়েসের একটি শিশু কম্পিউটার আয়ত্ত করেছে খুব সহজে। বিশেষ করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অ্যানিমেশনের মতো একটি বিষয়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে। এরকমই এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে উত্তরাখণ্ডের অমন রহমান— একটি ছোট্ট ছেলে। বর্তমানে অমনের বয়স চোদ্দ বছরের কাছাকাছি। কিন্তু মাত্র চার বছর বয়সেই সে অ্যানিমেশন জগতের দিগগজ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বয়স যখন তিন তখন থেকেই অ্যানিমেশনের প্রতি তার খুব ঝোঁক। পরবর্তীকালে সে বিষয়ে সফলতা লাভ করা সবই এক আশ্চর্যজনক প্রতিভা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। অমনরা দুই ভাই। অমনের বাবা তাঁর বড় সন্তানের জন্য একটি পুরনো

বাবা-মা'র সঙ্গে অমন।

কম্পিউটার কেনেন। কম্পিউটারে অমনের হাত দেওয়া বারণ ছিল। কারণ অমন কম্পিউটার ব্যবহার করলে তা নষ্ট হতে পারে। সুতরাং তার দাদা যখন কম্পিউটারের সামনে বসতো তখন অমনের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া উপায় থাকতো না। কিন্তু অমনের মন সে কথা মানতে পারেনি। নাছোড়বান্দা অমন সুযোগ পেলেই কম্পিউটারের সামনে বসতো এবং সেটিকে নিয়ে ক্রমাগত নাড়া-ঘাটা শুরু করে দিত। অমনের বয়স যখন চার বছর একদিন সে তাঁর বাবাকে তাক লাগিয়ে দেয়। অ্যাডব ফ্ল্যাশপ্লেয়ার সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইংরাজি বর্ণমালার একটি অ্যানিমেশন তৈরি করে যা দেখা মাত্রই তার বাবা অবাক হয়ে যান। অনুসন্ধান করতে থাকেন সন্তানের কৃতকর্মের সূত্র। সেদিনের পর থেকে অমন অ্যানিমেশন জগতে এক যথার্থ স্থান অর্জন করে ফেলে।

অমনের বাবা মুজিবুর রহমান তাঁর ছেলের সুপ্ত বাসনাকে রূপদানে সচেষ্ট হন। অ্যানিমেশন জগতের দিকপাল এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ছেলের সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন মুজিবুর। অমনের যা বয়স সেই বয়সে অসাধ্যকে সাধন করে ফেলার কাহিনি কেউই সেভাবে গুরুত্ব সহকারে শুনতে চায়নি। কিন্তু তার বাবা অ্যানিমেশন কলেজের এক শিক্ষককে অনুরোধ জানান যাতে তাঁর ছেলেকে কয়েকটা কাজ করতে দেওয়া হয় যার মাধ্যমে তার গুণমান বিচার করতে পারা যাবে। সেই শিক্ষক মুজিবুরের কথা মতো অমনকে কয়েকটা কাজ করতে দেন এবং কাজ দেখার পরে তিনি অমনের বাবাকে বলেন, ''এখন থেকে অমন আমাদের দায়িত্বে।'' মুহূর্তের মধ্যে অমনের জগৎ বদলে যায়। যা সত্যিই অমনেরও কল্পনার বাইরে ছিল। মাত্র ৪ বছর বয়সেই অমন ১ হাজারের ওপর অ্যানিমেশন সিনেমা তৈরি করে ফেলে যার প্রত্যেকটির সময়সীমা ২ থেকে ১২ মিনিট।

এ বিষয়ে অমনকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, ''আমি ১৮ রকম অ্যানিমেশনের কাজ জানি এবং সেই সঙ্গে অ্যানিমেশন টুলস, জাভা স্ক্রিপ্ট, এইচ টি এম এল-এর কাজ জানি।'' অপরিপক্ক অথচ সংযত ভাবে অমন জানায়, ''অ্যানিমেশন টুলস-এর মধ্যে থ্রিডি ম্যাক্স, মায়া ফ্লাশ, ইমেজ রেডি, ফটোশপ, আফটার এফেক্টস এবং সাউন্ড ফোর্য জানি। অর্থাৎ অ্যানিমেশন তৈরি করতে গেলে যা যা কারিগরি পদ্ধতি মেনে কাজ করতে হয় সেই সবকটি সফটওয়্যারই অমনের জানা। একটি অ্যানিমেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যা শিখতে গেলে কমপক্ষে পনেরো মাস সময় লাগে তা মাত্র তিন মাসেই আয়ত্ত করে ফেলেছিল অ্যানিমেশন জগতের সর্বকনিষ্ঠ দিকপাল অমন রহমান। এই সবকটি সফটওয়্যারকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে অমন প্রতিদিন গড়ে ৮ ঘণ্টা সময় দিত।

অমনের বাবা পেশায় একজন মোটরবাইক গ্যারেজের মিস্ত্রি। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ যাতে সুদৃঢ় হয় সে ব্যাপারে পিছপা হননি। মাত্র ৬ বছর বয়সেই দেরাদুনের কলেজ অব ইন্টারেক্টিভ আর্টস্-এ ভর্তি করে দেন অমনকে। এই বয়সের দ্বিগুণরাও যা পড়ার কল্পনা করতে পারে না তা করে দেখিয়েছে সে। অমন এই কাজের জন্য দেশি-বিদেশি হাজার হাজার সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে জাতীয় শিশু সম্মানে পুরস্কৃত হয়েছে অমন। এছাড়াও চীনের সুপ্রিম মাস্টার চিং হাই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নগদ টাকা পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। এনএটিআইও নামক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে আনমোল রতন পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও ৮৪টি টিভি চ্যানেল অমনের সাক্ষাৎকার নেয় এবং অগুনতি সংবাদপত্রে অমনের সম্পর্কে লেখা বের হয়। বর্তমানে অমনকে চীন ও অস্ট্রেলিয়ার বহু নামী সংস্থা থেকে কাজের জন্য ডাকা হচ্ছে। তাই আগামীদিনে অমনের কাছ থেকে নতুন কি পাওয়া যায় সেটাই দেখার।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

''সাধারণের ধারণা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে নিরাপত্তা ও আরামের ভাব মিশ্রিত থাকে। এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর হতে পারে না। তোমরা তরুণেরা, সর্বদা নিজেদের এইরূপ কপট আধ্যাত্মিকতা থেকে রক্ষা করবে, যা সঙ্কটের মুখোমুখি হতে ভীত ও নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল। আমাদের ঋষিগণ তাঁদের জীবন ও কার্যে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতিফলিত করেছেন, তা কখনও সহজ আত্মরক্ষার মনোভাব বা জীবন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরূপ কাপুরুষতা নয়।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

রেনাল স্টোন নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

বর্তমান সময়ে রেনাল স্টোন বা মূত্রপাথরি এক স্বাস্থ্য সমস্যা। এই পাথর কিডনি বা বৃক্কে, মূত্রথলি ও মূত্রনালীতে হতে পারে। তবে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সাধারণভাবে আমাদের মূত্রে কিছু অদ্রবীভূত খনিজ লবণ ভেসে বেড়ায়। যখন এদের পরিমাণ সাধারণ পরিমাণের থেকে বেড়ে যায় তখনই এরা জমাট বাঁধে ও কিডনিতে পাথর তৈরি হয়। সাধারণত পাঁচ রকমের খনিজ লবণ যথা— ক্যালসিয়াম অক্সালেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ইউরিক অ্যাসিড, স্ট্রুভিট ও সিস্টিন থেকে মূত্র;পাথরি হয়। এদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ কিডনির পাথর হলো ক্যালসিয়াম যৌগ। ফলে এক্স-রে তে সহজেই ধরা পরে।

কারণ : যে সমস্ত কারণ কিডনিতে পাথর হওয়ার জন্য দায়ী সেগুলি হলো— কম পরিমাণে জল খাওয়া কিংবা জলীয় তরল পদার্থ কম খাওয়া। আবার অধিক পরিমাণে সোডিয়াম যুক্ত খাদ্য খাওয়া। কম পরিমাণে তন্তুজাতীয় খাদ্য খাওয়ার জন্য পৌষ্টিকনালীতে খাদ্যের সংবহন কমে যায়। ফলে রক্তনালীতে ক্যালসিয়াম শোষণ বেড়ে যায় যা প্রকারান্তরে মূত্রে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া, বসে কাজ করা, অধিক পরিমাণে মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া, অতিরিক্ত চুন খাওয়া এবং রক্ত সংবহন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ইত্যাদিও কিডনি-স্টোন গঠনের অনুকূল।

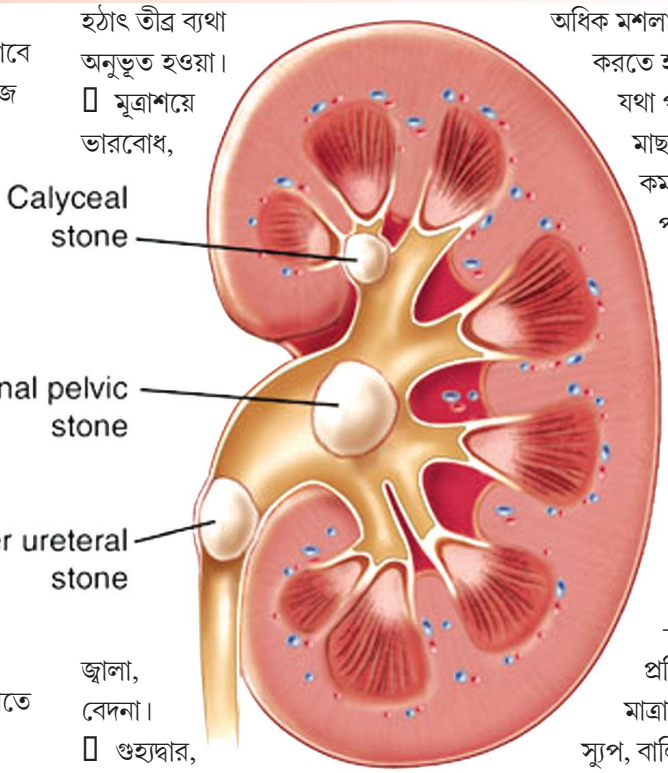

একবার পাথর হলে পাথর হবার প্রবণতা বাড়ে।

উপসর্গ : সাধারণত যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলি হলো—

- কোমরের পিছনের দিকে হঠাৎ তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া।
- মূত্রাশয়ে ভারবোধ, জ্বালা, বেদনা।
- গুহ্যদ্বার, পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশে বেদনা।
- কষ্টকর প্রস্রাব অথবা রক্ত প্রস্রাব হওয়া।
- কখনও কখনও ব্যথার সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
- মূত্রনালী ও মূত্রথলির সংযোগস্থলে পাথর অবস্থান করলে প্রস্রাবের গতি ও তীব্রতা কমে যায়।

খাওয়া-দাওয়া : মূত্রপাথরি হওয়াতে খাদ্যাভ্যাসের বড় ভূমিকা থাকে, তাই খাদ্য ও পানীয়র যথাযথ ব্যবহারে মূত্রপাথরি প্রতিরোধ করা যায়। খাদ্য-পানীয়র মধ্যে জলের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বেশি। বেশি পরিমাণে জল ও তরল গ্রহণ পুনরায় পাথর তৈরির প্রবণতাকে কমিয়ে দেয়। মূত্রপাথরি থেকে মুক্তি পেতে হলে অধিক মশলাযুক্ত খাদ্য পরিহার করতে হবে। প্রাণীজ প্রোটিন যথা পাঁঠার মাংস, বড় মাছ, মাছের ডিম ইত্যাদি কম খেতে হবে। সবুজ পাতাযুক্ত সব্জি, ফুলকপি, বিনস্, ডুমুর, ডিমের কুসুম ইত্যাদি প্রচুর খেতে হবে। টমাটো, পালংশাক, চকোলেট, চা, ঘি, মাখন ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। ভিটামিন সি মূ -পাথরি হওয়া প্রতিহত করে। পর্যাপ্ত মাত্রায় জল, ফলের রস, স্যুপ, বার্লি, ডাবের জল, লেবুর জল, তরমুজ, শসা, শাঁকালু খেতে হবে।

চিকিৎসা : মূত্র পরীক্ষা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এক্সরে দ্বারা সহজেই মূত্রপাথরি নির্ণয় করা যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। যেসব ওষুধ দিলে সফলতা পাওয়া যায় সেগুলি হলো— ক্যালকার্ব, লাইকোপোডিয়াম, ক্যান্থারিস, সিপিয়া, ফসফরাস, বার্বারিস, নাক্সভম ইত্যাদি ওষুধ।

তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের উদ্যোগে নিবেদিতার নাতনি সেলেন্ডা-কে সংবর্ধনা

স্বামীজীর চোখে ভারতকে দেখেছিলেন মার্গারেট নোবেল এলিজাবেথ। সেইটানে সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন তিনি। স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় ভগিনি নিবেদিতা। শুরু হয় তাঁর দেশসেবার কাজ। যে কাজ দেশবাসীর কাছে পরম পাওয়া হিসাবে রয়ে গেছে। এবার তাঁরই কৃতকর্মের সাক্ষী থেকে গেলেন ভগিনি নিবেদিতার দৌহিত্র সেলেন্ডা মার্গট জিয়ার্ডিন এবং তাঁর পুত্র জন গ্রো। এক সপ্তাহের সফরে তাঁরা বোস্টন থেকে কলকাতায় এসেছেন। ঘুরে দেখেছেন বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়ি, সারদামায়ের বাড়ি, স্বামী

বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে। এরপর তাঁরা যোগ দেন শিবপুর (বেসু) বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (অধুনা আই আই ই এস টি)।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের উদ্যোগে শিবপুর বেসুতে সেলেন্ডা মার্গট জিয়ার্ডিনকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসু'র নির্দেশক ড. অজয় রায়, রেজিস্ট্রার ড. বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সেলেন্ডা এবং জন। ডিরেক্টর ড. অজয় রায় বলেন, 'ভগিনি নিবেদিতার নাতনি আমাদের দেশে এসেছেন এই প্রথমবার। নিবেদিতার কাজ দেখে তিনি মুগ্ধ। আমাদের যুব সমাজের উচিত স্বামী বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতার ভাবধারাকে নিয়ে চলা। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে স্বামীজী চলে গেলেও আমাদের সমাজে তাঁর অবদান বিশাল। স্বামীজী চলে গেলেও তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন নিবেদিতা।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেলেন্ডা বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতার অসংখ্য বই আমি পড়েছি। যা পড়ে আমি খুব অনুপ্রাণিত বোধ করি। মহিলাদের জন্য নিবেদিতার যা কাজ তা সত্যিই প্রেরণাদায়ক। সে যুগে তিনি কতটা আধুনিক এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন তা বোঝা যায়। নিবেদিতা ভারতের ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়।' বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্তের কথাতে নিবেদিতা সম্বন্ধে অনেক অজানা কাহিনি উঠে এল। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের লেখায় নিবেদিতার কথা প্রথম উঠে আসে। ১৯০২-১৯১১ সালকে নিবেদিতা যুগ বলা হয়। ভারতের নারীশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা,

সমাবেশ সমাচার

ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন তিনি।' তবে এসবের পাশাপাশি রন্তিদেবের গলা থেকে ঝরে পরল ক্ষোভের সুর। তিনি বলেন, 'এত কিছুর পরেও যে সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল তা তিনি পাননি।' ভারতে আসার আগে নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডে মন্টেসরি ট্রেনিং চালু করেন। এছাড়াও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও নিবেদিতার অবদান বিশাল। স্বামীজীর মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত কাজ বেঙ্গালুরুর টাটা ইনস্টিটিউট তৈরিতে সাহায্য করেন ভগিনি নিবেদিতা। আবার জগদীশচন্দ্র বসুর— বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরির অন্যতম কারিগর ছিলেন এই মহীয়সী নারী।

এদিন বেসু'র নিবেদিতা নামাঙ্কিত মহিলা হোস্টেলের সামনে ভগিনী নিবেদিতার নবনির্মিত মূর্তির উন্মোচন হয়। সেখানেও মাল্যদান করেন সেলেন্ডা এবং জন। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী জন যে পরিচিত তাও লক্ষ্য করা গেল এদিনের মাল্যদান অনুষ্ঠানে। যা আজ স্বয়ং ভারতীয়দের মধ্যেও খুব কম লক্ষ্য করা যায়। তবে ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্যেও সেলেন্ডা মার্গট জিয়ার্ডিন এবং তাঁর পুত্র জন যেভাবে সময় দিয়েছেন তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ। বেসু'র অনুষ্ঠানে এসে তাঁরা যে খুব আনন্দিত একথাও জানান বছর আশির সেলেন্ডা। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মনোরম পরিবেশে তাঁরা যেন নিজেদের ভবিষ্যৎ সুগঠিত করতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিকতা এবং আতিথেয়তা তাঁকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। তবে কলেজ ক্যাম্পাস ছাড়ার আগে ভারতবাসীর প্রতি আন্তরিকতা, ভালবাসার টান যেমন ঝরে পড়ল তাঁর গলা থেকে তেমনি তাঁর নজর কেড়েছে কলকাতার রসগোল্লাও। সেলেন্ডা এবং জন দু'জনেই জানান, 'কলকাতার মানুষদের মতো কলকাতার রসগোল্লাও খুব সুন্দর'। ■

কলকাতায় ১১৮তম স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাগমন দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠের উদ্যোগে ও দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, টাকী বয়েজ হাইস্কুল, অভেদানন্দ বিদ্যালয় ও বহু ক্লাব, সমাজসেবী সংগঠন, বিদ্যালয়, ব্যবসায়িক সংস্থার সহযোগিতায় বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের আমেরিকা থেকে কলকাতায় পদার্পণের শুভ দিবসটি উদ্‌যাপিত হলো এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে। ১৮৮৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে মোম্বাসা জাহাজে চড়ে বজবজে আসেন। পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ থেকে ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ স্টেশনে নামেন ভোরবেলা। সেখান থেকে তাঁর গুরুভাইরা ও অনুগামী ভক্তরা ঘোড়ার গাড়িতে করে আলমবাজার মঠের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (পূর্বের রিপন কলেজ) ছাত্ররা গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টেনে নিয়ে চলেন সগৌরবে।

এইদিনের স্মরণে শিয়ালদহ সাউথ স্টেশনে এক প্রস্তরফলক বসানো আছে— 'এই সেই পথ' নামে। এদিন পূর্বরেলের পক্ষে বজবজ থেকে শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন পর্যন্ত ফুলমালায় সজ্জিত একটি স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়। বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি নিয়ে সন্ন্যাসীরা ও ভক্তরা বজবজ থেকে এই ট্রেনে কলকাতায় আসেন। পূর্বরেল ট্রেনটির নাম দেয় 'পুণ্যবাহন পূর্বরেল'। বজবজ থেকে আলমবাজার মঠ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ পুষ্পবৃষ্টি, শঙ্খধ্বনি ও জল, মিষ্টি, সরবত দিয়ে শোভাযাত্রাকে অভ্যর্থনা করেন।

পরলোকে চিত্তরঞ্জন পাল

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড় অঞ্চলের দুর্লভপুর গ্রাম নিবাসী চিত্তরঞ্জন পাল গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, সোমবার পরলোকগমন করেছেন। বছরখানেক তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর।

তিনি চার পুত্র, চার কন্যা, এক পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর দুই পুত্র বাসুদেব পাল ও প্রদীপ পাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক এবং আর এক পুত্র সন্দীপ পাল কলকাতা মহানগরের সঙ্ঘের একটি ভাগের কার্যবাহ। বস্তুত সঙ্ঘময় পরিবার, তাঁর প্রয়াণে সবাই শোকাহত। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

শ্রীমদভাগবদ কথা জ্ঞান যজ্ঞানুষ্ঠান

মালদা জেলার গাজোল হাইস্কুল ময়দানে গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীমদভাগবত কথা ও ভজন গান পরিবেশিত হয়। প্রবক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন আচার্য শ্রী কৌশিক মহারাজ। প্রতিদিন হাজার হাজার জ্ঞানপিপাসু ভক্ত উপস্থিত হয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা শ্রবণ করে ধন্য হন। এছাড়াও প্রতিদিন সকালে দেড় ঘণ্টা ভারত স্বাভাবিমান পতঞ্জলির পক্ষ থেকে যৌগিক আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি সমাপ্তি উৎসবে বিশাল হিন্দু সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইতিহাস গবেষক ড. তুষারকান্তি ঘোষ। সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন নরসিংহ প্রসাদ গুপ্ত, নীলকমল সরকার, নিখিলচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্ল কুমার বাগচী প্রমুখ।

মঙ্গলনিধি

দক্ষিণ ২৪-পরগনা (সুন্দরবন) জেলার অন্তর্গত সোনারপুর মহকুমার সহ-কার্যবাহ বাপ্পা সর্দার ও শ্রাবণী সর্দারের শুভ বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, নারায়ণ চন্দ্র পাল, অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী এবং স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য প্রমুখ।

***

গত ২৮ জানুয়ারি সুন্দরবন জেলার জয়নগর মহকুমা শারীরিক প্রমুখ উৎপল নস্করের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তার বাবা মদন নস্কর ও মা কাননবালা নস্কর মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা সেবাপ্রমুখ জয়দেব নস্করের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা প্রচারক অমিত সরকার-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৫ ফেব্রুয়ারি সিউড়ির সঙ্ঘ কার্যালয় কেশব তীর্থে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। কার্যক্রমে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন পূজ্যপাদ স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ। উল্লেখ্য, এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক। অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গের অনেক প্রচারক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষভাবে প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলোগ ও শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেন শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সংগীত পরিবেশন করেন মালা দাস, কাকলি দাস। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুব্রত সিনহা।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অরবিন্দ সাহা গত ৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। স্ত্রী, এক কন্যা ও নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন। তাঁর সহজ-সরল সদাহাস্যময় ব্যবহার সকলকে সহজেই আপন করে নিত।

তাঁর পরিবারের সকলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও আপনজন।

***

বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুর নিবাসী জয়ন্তী রায় গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আকস্মিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সহ-প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়ের তিনি মাতৃদেবী।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12

71, Park Street, Kolkata - 700 016

98311 85740, 98312 72657

Visit Our Website :

www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি স্মরণে সংস্কার ভারতী

প্রতিবেদক॥ নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি স্মরণে মাঘীপূর্ণিমায় দেশব্যাপী সংস্কার ভারতী উৎসবের মাধ্যমে দিনটি পালন করে। কলকাতায় গত ৩ ফেব্রুয়ারি মাঘীপূর্ণিমার সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা, নাটকের গান ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। ভাবসঙ্গীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী ভারতে নবজীবনম্' গানের পর সংস্কার ভারতী পূর্বক্ষেত্র-প্রমুখ ভরত কুণ্ডু তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, অতি প্রাচীনকালেই ভারতের নাট্যকথা উৎপন্ন ও সমাদৃত হয়েছিল। আমাদের ভারতীয় নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃত নাটক। ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র'-এ সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তির একটি উপাখ্যান বলেছেন। চতুর্বেদে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া কারো অধিকার ছিল না বলে গরিষ্ঠ জনতার দাবিতে ব্রহ্মা 'পঞ্চমবেদ' সৃষ্টি করতে বলেন। ঋক্‌বেদ থেকে পাঠ্য, যজুর্বেদ থেকে অভিনয়, সামবেদ থেকে সঙ্গীত ও অথর্ববেদ থেকে রস আহরণ করেই পঞ্চমবেদ সৃষ্টি হবে, যা একাধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য। ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ প্রয়োগ অর্থাৎ অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন আচার্য ভরতকে। তিনি একশত শিষ্যের সাহায্যে দেব ও অসুরের কাহিনি নিয়ে নাট্যরচনা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ভরত কুণ্ডু আরও বলেন, আচার্য ভরতের মতে অভিনয় চার প্রকার— 'আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।' অর্থাৎ আঙ্গিক অভিনয় বলতে বুঝি অঙ্গাদির অভিনয়। অঙ্গাভিনয় আবার তিন প্রকার--- শারীর, মুখজ ও চেষ্টাকৃত। বাচিকাভিনয় যথাযথ না হলে চরিত্র পরিস্ফুট হয় না। এরজন্য চাই রীতিমতো স্বরসাধনা, পরিস্ফুট উচ্চারণ, ছন্দ-লয়-যতি বিশিষ্ট বাগ্‌বিন্যাস, স্বর দ্বারা ভাবব্যঞ্জনা ইত্যাদি। সাজ-সজ্জা, অলঙ্কার, পোশাক ইত্যাদির দ্বারা হয় আহার্যাভিনয়। আর অভিনয়ে আন্তরিক ভাব প্রকাশের দ্বারা দর্শক চিত্তকে যথাযথ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করতে পারলে তা সত্ত্বাভিনয়। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের এত খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, সে যুগে আমাদের নাট্যকলা কত নিখুঁত, শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ছিল। নাট্যশিল্পের ব্যাকরণ আলোচনায় শুধু ভারতেই নয় বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও ভরতের নাট্যশাস্ত্রই প্রথম ও শেষ কথা। স্তানিশ্লাভস্কি বা ব্রেখট্ প্রমুখ নাট্যশাস্ত্রী তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন বলা যায়।

নাটকের গানে সংস্কার ভারতীর সঙ্গীতগোষ্ঠী। — ছবি : শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

এরপর সংস্কার ভারতীর সঙ্গীতগোষ্ঠী পুরনোদিনের বেশ কয়েকটি নাটকের গান পরিবেশন করে। ভাষ্যরচনা ও সঙ্গীতসংকলন বিকাশ ভট্টাচার্যের। ১৯৩৫-এ ভারতচন্দ্র রায় তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের জন্য লিখেছিলেন, 'কি বলিলি মালিনী ফিরে ফিরে বল' টপ্‌পা অঙ্গের এই গানটি দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর গোপাল উড়ের সহজকথায় লেখা 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কালাংড়া, আড়খেমটা আঙ্গিকের 'ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চবেড়া' সমবেত কণ্ঠে গীত হয়।

লিপিকা হালদার গেয়ে শোনান মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকের গান 'এখন কি আর নাগর তোমার, আমার প্রতি তেমন আছে'। ১৮৭৩-এ লেখা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' নাটকের ঢিমা ত্রিতালে বাঁধা 'ভালোবাসা ভুলি কেমনে' গানটি গেয়ে শোনান ইন্দ্রাণী শর্মা। জানা ছিল না জনপ্রিয় শ্যামাসংগীত 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল' গানটি ১৮৮১ সালে মঞ্চস্থ 'মাধবী কঙ্কণ' নাটকের গান। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা গানটি গেয়ে শোনান মিতালী ভট্টাচার্য। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধচরিত' নাটকের 'জুড়াইতে চাই— কোথায় জুড়াই?' গানটি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান। গানটি পরিবেশন করেন অমিত দে। অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' নাটকের 'আমি যেন ছবিটি, ললিতলবঙ্গলতা কবিটি'--- গাইলেন কুন্তলা ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকের 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না' গাইলেন দেবাশিস লাহিড়ি। নজরুল মন্মথরায়ের কারাগার নাটকের জন্য মোট দশটি গান লেখেন। স্বপ্না চক্রবর্তী তারই একটা 'তিমির বিদারি অলকবিহারী' গানটি গেয়ে শোনান। এছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূরজাহান' নাটকের 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই' এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বাংলার মসনদ্' নাটকের 'এসো সোনার বরণী' গানদু'টি সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। অংশ নেন দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বেবী দত্ত, গোবিন্দ বসাক, মন্দিরা দে, মালবিকা সাহা, মনোরমা দাস, শ্রীলাকী সরকার, রূপা দে। ভাষ্যপাঠে সকলকে মুগ্ধ করে ঈপ্সিতা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি অভিনব এবং আকর্ষক। তবে সঙ্গতকারীদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা আর একটু ভালো হওয়ার দরকার ছিল। সবশেষে সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস অবলম্বনে 'ঠিকানা ভারতবর্ষ' মঞ্চস্থ হয়। নাটক ও নির্দেশনায় ছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য। ▮

শব্দরূপ-৭৩৯ শামাপ্রসাদ দাশ

■	১	২	■	৩	৪	■	■
■	■	■	■	৫	■	৬	■
৭	■	■	■	■	■	৮	৯
■	■	■	■	■	১০	■	■
১১	১২	■	■	■	১৭	■	■
১৩	■	■	১৪	১৯	■	২০	■
■	১৫	১৬	■	■	২২	■	■
■	■	১৭	■	■	■	■	■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মৎস্যভুক নক্র, ৫. অম্বুজ বৃক্ষ, ৭. কলকাতার সরকারি হাসপাতাল, ৮. যে দেশের রাজধানী লিমা, ১০. শ্লেষ, চোরা চাহনি, ১১. অষ্টপদী কীট, ১৩. কাব্যে আছে, ফলেও আছে, ১৪. তাপস পালের সফল ছবি, ১৫. নিম্নশ্রেণীর অনুন্নত বাঙালি হিন্দু জাতি, ১৭. জামার জন্য বোনা বস্ত্রখণ্ড।

উপর-নীচ : ২. প্রসেনজিৎ অভিনীত প্রথম ছবি, ৩. সূর্য, ৪. প্রকৃতির অন্যতম গুণ, ৬. নাগরা ও পাম্পশুর মাঝামাঝি আকারের জুতো, ৭. কুমার বয়স থেকে, ৯. রাগান্বিত চেহারা, ১০. অসার বা অবাস্তব বাক্য, ১২. শেষ থেকে ফুলটি গণ্ডগ্রামে মিলবে, ১৪. পিতামহী বা মাতামহী, ১৬. মাদার মিঠাই উল্টে পল্লীসংগীত।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

■	■	জ	তু	গৃ	হ	■	ত্র্য
বা	উ	ল	■	■	ড়	■	ম্ব
■	প	■	মে	■	পা	ব	ক
■	ন	হু	ষ	■	■	দ্ধ	■
■	য়	■	■	বি	শ্ব	পা	■
বি	ন	তা	■	লে	■	গ	■
শ	■	ড়	■	■	শ	ল	ভ
খা	■	কা	ল	বে	লা	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৩৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ মার্চ ২০১৫ সংখ্যায়

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নেত্রদান মহাদান
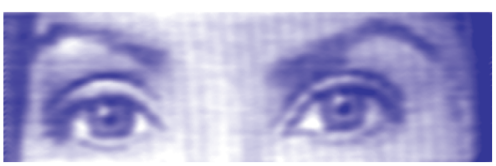
EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ১৬

স্বস্তিকা জাতীয় ভাবনার বাহক। সেই ভাবনা স্বস্তিকার মাধ্যমে যাঁরা প্রচার-প্রসারের কাজে যুক্ত তাঁরা স্বস্তিকার কার্যকর্তা। আপনার এলাকায় স্বস্তিকার কার্যকর্তার নাম ঠিকানা

হুগলী

- **সঞ্জয় ত্রিপাঠী**
  রিষড়া
  ৯৮৩০৪৩৭২৬৮
  ২৬৭২৭২১২
- **রামকৃষ্ণ শর্মা**
  পাণ্ডুয়া
  ৮৯৪৫৯৯৫৩৪৩
- **রতন ভট্টাচার্য**
  হুগলী
- **স্বপন বিশ্বাস**
  চুঁচুড়া
  ৯৩৩১৬৫৮৩৩১
  ৯৮০৪৬৫৬৬৮০
- **তপন মুখোপাধ্যায়**
  সোমড়া
  ৯৪৭৪৪৬৩৬৭০
- **দুর্গাগোপাল দে**
  ডানকুনি
  ৯০৫১২৮৪১৯৮
- **প্রবীর কুমার বর্ধন**
  উত্তরপাড়া
  ৯১৬৩৪৭০৩৪৩

তারকেশ্বর

- **অদ্বৈতনাথ দে**
  হরিপাল
  ০৩২১২-২৮১০১৫
- **আশুতোষ দে**
  হরিপাল
  ৯৪৭৪০৯৭২৩৩
- **তারক দেব**
  ধানিখালি
  ৮৯২৭০৩০৮৮৬
- **রাজকুমার দাস**
  আরামবাগ
  ৯৬৪১৩৩৪১৮২
- **প্রদীপ দত্ত**
  জাঙ্গীপাড়া
  ৮৫১৩০৩১১৮৪
- **অনুপ দাস**
  মশাট
  ৯৮৩১৮৬৯১০৩
  ৭৬০২৬৯৭৭৮৪
- **সিতাংশু সরকার**
  কামারপুকুর
  ৯৪৩৩১১০২৩৯
- **নিতাই নায়েক**
  কামারপুকুর
  ৯৪৭৪৪৬৭০৭৪২

কলকাতা

- **বিপুল গুহঠাকুরতা**
  বোড়াল
  ৯৭৪৮৭২৬৩০৬
- **প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**
  পাটুলি
  ৮৯০২২২৯৪৪২
- **বাদল মণ্ডল**
  বাঘাযতীন (দক্ষিণ)
  ৮১০০৪৩৮৭৬৮
- **চিত্তরঞ্জন পাত্র**
  বিধান সরণী
  ৯৬৭৪৫১৫৫২৩
- **পবন কুমার চৌধুরী**
  বেহালা
  ৯৪৩৩৬৫৬৭২৯
  ৯৬৭৪৫১৬৫০৬
- **আর সি ভাণ্ডারী**
  ক্যামাক স্ট্রিট
  ০৩৩-২২৮২৭২৮
- **নকুল সাহা**
  তালতলা, ধর্মতলা
- **তপন কাহার**
  শ্যামবাজার
  ৮৯৮১৭১৯৮৮২
- **মন্টু দাস**
  বেলেঘাটা
  ৯৮৭৪৯৯৩৮৭৫
- **কমল কেডিয়া**
  বড়বাজার
  ৯৩৩১১০৫৪৬৭
- **জীবনময় বসু**
  বাগবাজার
  ৯৯০৩১১৯১৩৫
- **ধ্রুব বসু**
  পশ্চিমপুটিয়ারী
  ৯৪৭৭০৬৪১৫০
- **অশোক মুখার্জী**
  ম্যুর অ্যাভিনিউ, টালিগঞ্জ
  ৯৪৭৭৪৫৮৩৩২
- **দেবাশিস দাস**
  ট্যাংরা
  ৯৮৮৩০৮৩৯৪৯
- **অচ্যুত কুমার গাঙ্গুলী**
  হরিদেবপুর
  ০৩৩-২৪০২১২৩৪
  ৯৯০৩৪০১৬৮৩
- **সুবল দত্ত**
  দুর্গানগর
  ৯০৩৮৬৭৫৬৭১
- **এম পি শর্মা**
  টালিগঞ্জ
  ৯০৩৮৪০৮৩৫৬
- **জয়ন্ত বসু**
  সন্তোষপুর
  ৯৪৩২২৮১১৮৩
- **শশাঙ্ক ভৌমিক**
  বেহালা
  ৯৬৭৪৫১৬৫০৬

উত্তর ২৪ পরগনা

- **কানাইলাল দাস**
  চাঁদপাড়া বাজার
  ৯৬৭৪১৬২০১১
- **সুব্রত চট্টোপাধ্যায়**
  মতুয়াধাম
  ৯৬৭৪১৬২০১১
- **শঙ্কর চক্রবর্তী,** নবনগর
  ৯৮৮৩৪৮৬৬৯১
- **স্বপন কুমার সরকার**
  বেলঘরিয়া
  ৯১৬৩১৯৮৯৫০
- **বিশ্বনাথ রায়, সুখেন্দু মণ্ডল**
  বসিরহাট
  ৭০৭৪২৬৬১৭৫
- **তপন শীল,** বারাসাত
  ৯১৪৩১৫৩০৬৫
- **শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়**
  নিউ ব্যারাকপুর
  ৮০১৭২১৭৯৯৪
- **প্রতাপ বিশ্বাস,** হাসনাবাদ
  ৯৭৩৩৯০১০৯৭
- **সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়**
  বেলঘরিয়া
  ৮৯০২১২৮৩১২
- **দেবু দাস,** ব্যারাকপুর
  ৯০৩৮৫৭৪৬০১
- **কৌশিক মজুদার**
  দেবালয়
  ৮০০১৮৮৮৯৯৭
- **শঙ্কর কুমার রায়/সুলেখা**
  আগরপাড়া
  ৯৮৩০৪০৯০৭০
  ৯৮০৪৮১৪০৪৯
- **সুকুমার নাথ**
  বনগাঁ
  ৯৭৪৮০৯১৭৪৯

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
2 March - 2015

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা